প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৭ | ৯ -১৫ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

৯ আগস্ট, ২০২৬

প্রাণচং ম্রো, ফুটবলার

ঋতুপর্ণা চাকমা, ফুটবলার

মারীয়া মান্দা, ফুটবলার

আদিবাসী ধাত্রীদের সম্মান:

জীবন ও সুস্থতা সুরক্ষায় তাদের অবদান

আদিবাসী দিবসঃ 'সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের আহ্বান'

নারী ও শিশুর নিরাপত্তাঃ নীরবতা ভেঙে চাই এখনই পদক্ষেপ

আদিবাসী দিবস: আদিবাসীদের প্রাণের কথাগুলো শোনার কী কেউ নেই!

শিউলি আজিম, ফুটবলার

নাম্বিয়া লুইজি নকরেক, ক্যারাতে

স্মৃতি কিস্কু, ফুটবলার

BECOME A PRO CHEF

ICIDANIEL10
Cut this part and bring it along to get a 10% scholarship.

OUR COURSES

1 YEAR — DIPLOMA IN GLOBAL CULINARY ARTS
Course Fee: 1,65,000 BDT
Payable in 4 Installments.

3 MONTHS — PROFESSIONAL CHEF COURSE LEVEL-I
Course Fee: 48,000 BDT
Payable in 3 Installments.

3 MONTHS — PROFESSIONAL BAKERY, PASTRY & PATISSERIE COURSE, LEVEL-I & II
Course Fee: 45,000 BDT
Payable in 3 Installments.

1 MONTH — PROFESSIONAL BARISTA & MOCKTAIL COURSE
Course Fee: 15,000 BDT
One-time payment.

5 DAYS — PROFESSIONAL FOOD HYGIENE & HACCP COURSE, LEVEL-I & II
Course Fee: 7,500 BDT
One-time payment.

VISIT US:

ICI INTERNATIONAL CULINARY INSTITUTE

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ও আধুনিকায়নে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে চলেছে ICI-International Culinary Institute। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির একটি সময়োপযোগী বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি. গোমেজ এই কালিনারি ইন্সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুল সমাদৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলী ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে সাজানো ICI-এর শিক্ষাক্রম মূলত Culinary Arts এবং Hospitality Management-এর এক অনন্য সমন্বয়। সময়ের দাবি এবং পেশাগত বাজারের চাহিদাকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেশনাল শেফ কোর্সের পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন গ্লোবাল কালিনারি আর্টস, বারিস্তা ও মকটেল কোর্স, বেকারি, পেস্ট্রি এবং প্যাটিসেরি কোর্স-এর মতো যুগোপযোগী ও উদ্ভাবনী কোর্স পরিচালনা করছে। এসবের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা বিবেচনায় সম্প্রতি আমরা ফুড হাইজিন এবং হ্যাসাপ কোর্স নিয়ে এসেছি। শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতা, স্থায়িত্বশীলতা এবং উদ্যোক্তা সুলভ মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়ে-ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান গ্লোবাল কালিনারি ইন্ডাস্ট্রি-র যোগ্য ও দক্ষ পেশাদার শেফ হিসেবে গড়ে তোলাই ICI-এর মূল লক্ষ্য।

OUR CAMPUSES

DHAKA CAMPUS
Address: House #84, Lift 5, Road #7/A, Dhanmondi, Dhaka.
Contact: 01733792837

CHATTOGRAM CAMPUS
Address: House #7/A/1, Road #3, South Khulshi, Chattogram.
Contact: 01708533767

SYLHET CAMPUS
Address: House #3, Block #C, Upashahar, Main Road, Sylhet.
Contact: 01746247737

OUR AFFILIATIONS: Qualifications Scotland, WCS World Culinary Society

বিপ্র/১৫৭/২৬

জেরী প্রিন্টিং প্রেস
বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম জেরী প্রিন্টিং।

সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে
হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৭
০৯ আগস্ট - ১৫ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৫ শ্রাবণ - ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

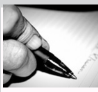

সম্পাদকীয়

শুধু সৌন্দর্য নয়, বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠুক আদিবাসীরা

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও হয়তো নানা বাহারি রঙে সজ্জিত হয়ে আদিবাসীরা ও তাদের একদিনের শুভাকাঙ্খীরা অনেক অনুষ্ঠান করবে। তবে পৃথিবীর আদিবাসী জনগোষ্ঠী শুধু একটি জাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বাহক নন; তাঁরা মানবসভ্যতার প্রাচীন জ্ঞান, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এক অনন্য উত্তরাধিকার বহন করে চলেন। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য–“আদিবাসী ধাত্রীদের সম্মান: জীবন ও সুস্থতা সুরক্ষায় তাঁদের অবদান”–বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও জীবনচর্চা আজও মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, খাসিয়া, মণিপুরি, ওরাঁও, মুন্ডা, মাহালী, পাহাড়ী, রাখাইনসহ প্রায় ৫০টিরও বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাঁরা দেশের পার্বত্য অঞ্চল, সমতল, বনাঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে আজও টিকে আছেন। কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, পরিবেশ রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু তাঁদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস খুব কমই আলোচনায় আসে। দুর্গম পাহাড়ে কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামের কঠিন বাস্তবতায় প্রতিদিন তাঁরা সংগ্রাম করেন জীবিকার জন্য। অনেক পরিবার এখনো মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ বাসস্থান এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ভূমির নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সামাজিক বৈষম্য তাঁদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। তবুও তাঁরা পরিশ্রমে বিশ্বাস করেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই মাঠে, বাগানে কিংবা জুমচাষে তাঁদের কর্মযাত্রা শুরু হয়। নারীরা সংসার সামলানোর পাশাপাশি কৃষিকাজ, হস্তশিল্প ও সন্তান লালন-পালনে সমান অবদান রাখেন। এই পরিশ্রম, সততা এবং আত্মমর্যাদাবোধ বাংলাদেশের জন্য এক অনুকরণীয় সম্পদ।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, “ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন” *(আদি পুস্তক ১:২৭)*। তাই প্রতিটি মানুষের মর্যাদা সমান এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি কিংবা সামাজিক অবস্থানের কারণে কোনো মানুষকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। যিশু খ্রিস্ট তাঁর সমগ্র জীবনে সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সুসমাচার আমাদের শেখায়–যেখানে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, সেখানে খ্রিস্টানদের ন্যায়বিচার, ভালোবাসা ও সংহতির পক্ষে দাঁড়াতে হবে।

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষাও একই আহ্বান জানায়। মানবমর্যাদা, সাধারণ কল্যাণ, সংহতি এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি দায়িত্বশীলতা–এই চারটি মৌলিক নীতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও অধিকারের প্রশ্নে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মণ্ডলী বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে উন্নয়ন তখনই প্রকৃত উন্নয়ন, যখন তা কাউকে পিছনে ফেলে রাখে না। আদিবাসীদের উন্নয়ন তাঁদের সংস্কৃতি, ভাষা ও পরিচয়কে অস্বীকার করে নয়; বরং সেগুলোকে সম্মান জানিয়ে হতে হবে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অনেক আদিবাসী তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষা, প্রশাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, উন্নয়নকর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে সুযোগ পেলে তাঁরা দেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারেন। প্রয়োজন কেবল বৈষম্য দূর করে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিশেষভাবে এ বছরের প্রতিপাদ্য আমাদের আদিবাসী ধাত্রীদের অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্গম অঞ্চলে বহু বছর ধরে তাঁরা ঐতিহ্যগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং মানবিক সেবার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের পাশে থেকেছেন। তাঁদের জ্ঞানকে অবহেলা না করে আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করা হলে দেশের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য আরও শক্তিশালী হতে পারে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক–বাংলাদেশের আদিবাসীদের আমরা কেবল উৎসবের রঙিন পোশাক, নৃত্য কিংবা পর্যটনের আকর্ষণ হিসেবে দেখব না। তাঁদের দেখব দেশের উন্নয়নের সমঅংশীদার হিসেবে। তাঁদের ভাষা সংরক্ষণ, সংস্কৃতির বিকাশ, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ ভূমির অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ দায়িত্ব।

এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে আসুন আমরা এমন একটি বাংলাদেশের জন্য প্রার্থনা এবং কাজ করি, যেখানে আদিবাসীরা শুধু আমাদের দেশের সৌন্দর্যের প্রতীক নন, বরং তাঁদের মেধা, পরিশ্রম, সততা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেন। †

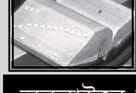

লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন। (মথি ১৪: ২৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

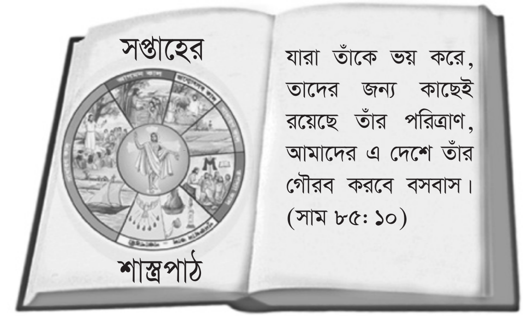

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৯ আগস্ট - ১৫ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৯ আগস্ট, রবিবার
সাধারণকালের ১৯তম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
১ রাজা ১৯: ৯, ১১-১৩, সাম ৮৫: ৮-১৩, রোম ৯: ১-৫, মথি ১৪: ২২-২৩

১০ আগস্ট, সোমবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু লরেন্স, ডিকন ও ধর্মশহীদ, *স্মরণ দিবস*
২ করি ৯: ৬-১০, সাম ১১১: ১-২, ৫-৯, যোহন ১২: ২৪-২৬

১১ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধ্বী ক্লারা, কুমারী, *স্মরণ দিবস*
এজে ২: ৮-৩: ৪, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, মথি ১৮: ১-৫, ১০, ১২-১৪

১২ আগস্ট, বুধবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধ্বী যোহান্না ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, *সন্ন্যাসব্রতী*
এজে ৯: ১-৭; ১০: ১৮-২২, সাম ১১৩: ১-৬, মথি ১৮: ১৫-২০

১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু পন্‌সিয়ানুস, পোপ এবং সাধু হিপ্পোলিটুস, যাজক, *সাক্ষ্যমরগণ*
এজে ১২: ১-১২, সাম ৭৮: ৫৬-৫৯, ৬১-৬২, মথি ১৮: ২১--১৯: ১

১৪ আগস্ট, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে, যাজক ও ধর্মশহীদ, *স্মরণ দিবস*
এজে ১৬: ১-১৫, ৬০, ৬৩ (বিকল্প: এজেঃ ১৬: ৫৯-৬৩), সাম ইসা ১২: ২, ৪-৬, মথি ১৯: ৩-১২

১৫ আগস্ট, শনিবার
সাধারণকালের ১৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
এজে ১৮: ১-১০, ১৩, ৩০-৩২, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ১৯: ১৩-১২
শনিবার সন্ধ্যা, কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, মহাপর্ব
১ বংশ ১৫: ৩-৪, ১৫-১৬; ১৬: ১-২, সাম ১৩২: ৮-৯, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৭, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৯ আগস্ট, রবিবার
+ ২০১৪ সি. এম. জেমস দেশাই, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৫৩ ফা. মাথিয়াস জে. ওসভাল্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ সি. এনরিকা কস্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার আলফ্রেড গমেজ (ঢাকা)
+ ২০২৪ সি. এম. এলিজাবেথ, এমসি

১১ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৫ সি. এম. ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন, সিএসসি
+ ১৯৬০ ফা. বেনিতো রোতা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সি. মেরী বার্ণার্ড, এমসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. জুলিও বেরুত্তি, পিমে

১২ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৬০ ব্রা. যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)
+ ২০২২ ফা. এমিলিও স্পিনেল্লি, পিমে (রাজশাহী)

১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৩ সি. এম. কলম্বা ক্ল্যান্সি, সিএসসি
+ ১৯৮০ ফা. চেস্টার স্লাইডার, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৭২ ফা. আঞ্জেলো মাজ্জোনি (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. মেরী কণিকা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৯৮ সি. ডামিয়েন বুশের, সিএসসি
+ ২০১৬ সি. এম. আন্তনিয়া, এমসি
+ ২০২৪ ফা. আবেল বালিষ্টিন রোজারিও (ঢাকা)

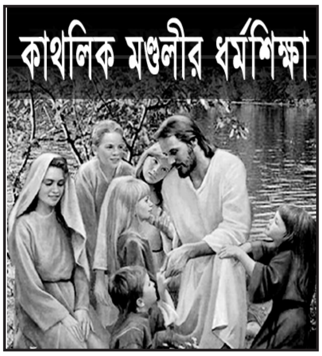

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৪২ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ যদি নৈতিক বিধান, ব্যক্তির মৌলিক অধিকার অথবা সুসমাচারের শিক্ষার পরিপন্থী হয়, তবে নাগরিকরা বিবেকের দাবি অনুযায়ি তা মানতে বাধ্য নয়। সদ্বিবেকের বিরুদ্ধে সরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার যুক্তিসঙ্গত কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা এবং রাজনৈতিক সমাজের সেবা করার মধ্যে পার্থক্য। "তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।" "মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে আমাদের বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত।"

গণপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি তার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে নাগরিকদের উপর নির্যাতনও করে, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ মঙ্গলের দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করা নাগরিকদের উচিত নয়: কিন্তু প্রাকৃতিক বিধান এবং সুসমাচারীয় বিধানের আওতাধীনে থেকে সেরূপ কর্তৃপক্ষের অনাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ও সহ-নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ আইনসঙ্গত।

২২৪৩ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ বৈধ নয় যদি না নিম্নোক্ত সকল শর্ত পূরণ হয়; (১) মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন সুনির্দিষ্ট, গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে, (২) অন্যান্য সব প্রচেষ্টার উপায় ব্যর্থ হলে, (৩) এ ধরনের প্রতিরোধ আরো মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে না এমন হলে; (৪) সাফল্য লাভের ভাল ভিত্তি আছে এমন হলে; (৫) অদূর ভবিষ্যতে এর চাইতে উত্তম সমাধানের যুক্তিসম্মত সম্ভাবনা না থাকলে।

রাজনৈতিক সমাজ এবং খ্রীষ্টমণ্ডলী

২২৪৪ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে মানুষের দর্শন ও তার লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই দর্শন ও লক্ষ্যই তার মূল্যায়ন, মূল্যবোধের শ্রেণীবিন্যাস এবং আচরণবিধির মানদণ্ড। প্রায় সব সমাজই বস্তুর চাইতে মানুষের প্রাধান্য স্বীকার ক'রেই তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছে। একমাত্র ঐশপ্রকাশজাত ধর্মই সৃষ্টিকর্তা ও ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে মানুষের উৎস এবং লক্ষ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে। ঈশ্বর এবং মানুষ সম্বন্ধে প্রেরণদায়ী এই সত্যের প্রেক্ষাপটেই খ্রীষ্টমণ্ডলী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে তাদের বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার আহ্বান জানায়।

যে-সব সমাজ এ দর্শনকে স্বীকৃতি দেয় না বা তারা ঈশ্বরের অধীন নয় বলে দাবি করার নামে এটা প্রত্যাখ্যান করে, তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই তাদের মানদণ্ড ও লক্ষ্য খুঁজতে বাধ্য হয় অথবা কোন মতবাদ থেকে ধার করে নেয়। যেহেতু ভাল ও মন্দের কোন বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড স্বীকার করে না বলেই তারা ঔদ্ধত্য সহকারে মানুষ ও তার ভাগ্যের এপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার করে। ইতিহাসে এর বহু নজির পাওয়া যায়।

২২৪৫ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অধিকরের কারণে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে কোন প্রকারেই রাজনৈতিক সমাজের সাথে তুলনা করা যাবে না। খ্রীষ্টমণ্ডলী মানবব্যক্তির লোকাতীত বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন এবং সংরক্ষণ দুই-ই। নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং তা উৎসাহিত করে।

২২৪৬ "মানুষের মৌলিক অধিকার অথবা পরিত্রাণের দাবিতে, প্রয়োজনে এমন কি রাজনৈতিক বিষয়েও নৈতিক সিদ্ধান্ত দেয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীর মিশন-দায়িত্বের অঙ্গ। খ্রীষ্টমণ্ডলী কেবলমাত্র সেইসব উপায় অবলম্বন করতে পারে যা সুসমাচারের সঙ্গে এবং স্থান ও কালের বিভিন্নতা অনুযায়ী সকল মানুষের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

২২৪৭ *"তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে" (দ্বি: বিবরণ ৫:১৬; মার্ক ৭-১০)।*

২২৪৮ *চতুর্থ আজ্ঞানুসারে, ঈশ্বর চেয়েছেন যে, প্রথমে তাঁকে এবং তারপর আমরা আমাদের পিতামাতা এবং তিনি যাদের উপর আমাদের মঙ্গলের জন্য অধিকার অর্পণ করেছেন তাদের সম্মান করি।*

আদিবাসী দিবসঃ আদিবাসীদের প্রাণের কথাগুলো শোনার কী কেউ নেই!

মিথুশিলাক মুরমু

বছরান্তে ৯ আগস্ট ফিরে আসে, আদিবাসীরা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, দিবসকে স্বাগত জানানো হয় আপন সংস্কৃতিতে– গানে, নাচে, আলোচনায় এবং কতকগুলো অব্যক্ত কথাগুলো উচ্চারণ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষও এই দিনটিতে বুক ভরা প্রত্যাশা আর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আকুতি নিয়ে রাজপথে নামে কিন্তু অত্যন্ত বেদনার বিষয় হলো, প্রতি বছর এই দিবসটি আমাদের সামনে একরাশ সাংস্কৃতিক রঙ ছড়ালেও, আদিবাসীদের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নগুলো দীর্ঘ রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। দিবস উদ্‌যাপনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অবদানের কথা উচ্চারিত হয়। শুভেচ্ছা, প্রতিশ্রুতি ও সহমর্মিতার ভাষণও শোনা যায় কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, বছরের পর বছর ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে মৌলিক দাবিগুলো উত্থাপন করে আসছে, সেগুলো কী বাস্তবে নীতিনির্ধারণে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে? বাংলাদেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী আদিবাসীর সংখ্যা ৫৪টির বেশি, যদিও বিভিন্ন গবেষক ও সংগঠনের মতে এ সংখ্যা আরও বেশি বলে অনুমিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ, মধুপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, পটুয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাস। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনধারা। আদিবাসী জনগণ প্রকৃতির রক্ষক এবং অমূল্য জ্ঞান ও ঐতিহ্যের ধারক। এই বৈচিত্র্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদকে আরো সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু উন্নয়নের মূলধারায় তাদের অংশগ্রহণ এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। আদিবাসী সংগঠনগুলোর দাবিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেগুলোর বেশিরভাগই নতুন নয়। বহু বছর ধরে একই দাবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়ন, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবায় সহজ প্রবেশাধিকার, উন্নয়ন প্রকল্পে যথাযথ অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে এসব দাবিই নতুন করে সামনে আসে কিন্তু দিবস শেষ হলে আলোচনাও যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায়। বিশেষ করে ভূমির প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমতল অঞ্চলের বহু আদিবাসী পরিবার বছরের পর বছর ধরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, দখল, উচ্ছেদ কিংবা দীর্ঘ আইনি জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও গবেষণায় উঠে আসছে। ভূমি শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ নয়; এটি তাদের পরিচয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে ভূমির নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়নের কথাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যেমন হয়েছে, তেমনি চ্যালেঞ্জও রয়ে গেছে। প্রাথমিক স্তরে কয়েকটি আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয় কিন্তু অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং ধারাবাহিক শিক্ষানীতি না থাকায় কাঙ্খিত সুফল পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। ফলে অনেক শিশু মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। দুর্গম অঞ্চলের বহু মানুষ এখনও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। অনেক তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও কর্মসংস্থানে বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকির মুখোমুখি হোন। এসব সমস্যা সমাধানে বিচ্ছিন্ন প্রকল্প নয়, দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে শুধু সরকারের সমালোচনা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সরকার বিভিন্ন সময়ে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগও নিয়েছে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প তার উদাহরণ। এসব উদ্যোগকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা জরুরি। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আদিবাসী প্রতিনিধিদের বৈঠকেও ভূমি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। এই ধরনের সংলাপ অবশ্যই ইতিবাচক কিন্তু সংলাপের প্রকৃত মূল্য তখনই সৃষ্টি হবে, যখন আলোচনার ফল বাস্তবায়নের রোডম্যাপে পরিণত হবে এবং তার অগ্রগতি জনগণের সামনে নিয়মিত তুলে ধরা হবে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কেবল সাংস্কৃতিক উৎসবের দিন নয়; এটি আত্মসমালোচনারও দিন। রাষ্ট্রের জন্য এটি একটি সুযোগ–কতোটা অগ্রগতি হয়েছে, কতোটা বাকি আছে এবং কীভাবে বৈষম্য কমানো যায় তা মূল্যায়নের। একইভাবে আদিবাসী সংগঠনগুলোর জন্যও এটি গঠনমূলক সংলাপ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব উপস্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার এবং আইনের সমান সুরক্ষার কথা বলে। এই সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন এমন নীতি, যেখানে উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছেও সমানভাবে পৌঁছাবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের অংশীদার না করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে মঞ্চে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি যদি বছরের বাকি সময়েও সমান গুরুত্ব পায়, তাহলে এই দিবসের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় প্রতিবছর একই দাবি, একই আলোচনা এবং একই প্রত্যাশার পুনরাবৃত্তিই চলতে থাকবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশেষ কোনো অনুগ্রহ চায় না; তারা চায় সংবিধানসম্মত অধিকার, মর্যাদা এবং উন্নয়নের সুযোগ। সময়ের দাবি হলো–আদিবাসী দিবসকে শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে বাস্তব পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ একটি রাষ্ট্র তখনই সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠে, যখন তার সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরও সমান গুরুত্ব পায়। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে এই সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন পুরো দেশ এক নতুন, বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন আদিবাসী সমাজের কণ্ঠস্বরকে এভাবে অবহেলা করা কেবল এক ঐতিহাসিক অন্যায়ই নয়, বরং একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নের পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের প্রকৃত সার্থকতা সেখানেই। কবির ভাষায়– 'আমরা উপজাতি নই, আমরা এই মাটির আদিবাসী,

আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই অরণ্য কেটে করেছে জনপদ।

সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডার রক্তে ভেজা বরেন্দ্রর মাটি,

এখানেই আমাদের জন্ম, এখানেই আমাদের শেষ শয্যা।

... ...

আমরা কোনো করুণা চাই না, চাই না কোনো দয়া,

সংবিধানের পাতায় আমরা আমাদের নাম ফিরে পেতে চাই।

যতক্ষণ না পাবো আমাদের চিরায়িত ভূমির অধিকার,

যতক্ষণ থামবে না এই মাদলের ডাক, এই আদিবাসী চিৎকার।'

‘আদিবাসীরা’ নামে পরিচিত হতে চায় তারা

জ্যাষ্টিন গোমেজ

বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়, দুই ভূখণ্ড জুড়েই বাস করে এমন এক জনগোষ্ঠী, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা জীবনধারা টিকিয়ে রেখেছে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, খাড়িয়াসহ অসংখ্য জাতিসত্তার এই মানুষদের রাষ্ট্র চেনে “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী” নামে। কিন্তু তারা নিজেদের চেনাতে চায় অন্য একটি নামে। “আদিবাসী”। এই একটি শব্দ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলছে বিতর্ক, রাজনীতি আর আইনি টানাপোড়েন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান সংশোধনীর পর থেকে “আদিবাসী” শব্দটি সাংবিধানিকভাবে অনুপস্থিত, যদিও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূমির অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ আর মর্যাদার প্রশ্ন।

কেন এই নামের জন্য এত লড়াই? কেবল কি শব্দগত বিতর্ক, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে ভূমি হারানোর যন্ত্রণা, পরিচয় সংকট, আর বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস? সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে ধর্মীয় নেতা, অধিকারকর্মী, আইনজীবী ও তরুণ প্রজন্ম, প্রত্যেকেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। চলুন তাহলে দেখা যাক, এই বিষয়ে তারা সরাসরি কি জানিয়েছেন।

“ক্ষুদ্র” নয়, “মর্যাদার” প্রশ্ন

আন্না মিনজ, সংসদ সদস্য

সমতলের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে পৌঁছানো আন্না মিনজ প্রায় ৩০ বছর ধরে উন্নয়ন খাতে কাজ করেছেন। উত্তরাঞ্চলের ওরাঁও আদিবাসী গোষ্ঠীর এই কাথলিক নারী সমতলের প্রথম আদিবাসী নারী সংসদ সদস্য।

তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকে পরিবারের কাছেই তিনি নিজেদের “আদিবাসী” পরিচয়ে চিনে এসেছেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী” শব্দ যুক্ত হওয়ার সময় অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন, কারণ “ক্ষুদ্র” শব্দটি ছোট-বড় জাতির বিভাজন তৈরি করে, যেখানে মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদার দাবিদার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি “আদিবাসী” পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধান অনুযায়ী “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী” শব্দই ব্যবহার করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি, এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৩১ দফা ও ভিশন-২০৩০-এ নৃগোষ্ঠীর বিষয়ে ইতিবাচক দিকনির্দেশনা থাকায় তিনি আশাবাদী যে স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

ভূমির অধিকার আর ঐক্যের ডাক

বিশপ জের্ভাস, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস সরাসরি সরকারের কাছে আদিবাসী জনগণের ভূমির বৈধ অধিকার স্বীকৃতির দাবি তোলেন। তার মতে, আদিবাসীরাই এই ভূমির আদি বাসিন্দা, বাঙালিরা পরে এসেছে, তাই নাগরিক হিসেবে তাদের ন্যায্য অংশ পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জাতীয় পর্যায়ে তারা এখনও সেই অংশ থেকে বঞ্চিত।

তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেন, কাথলিক বা খ্রিস্টান আদিবাসীদের অনেক সময় অখ্রিস্টান আদিবাসীরা আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, যা তাদের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে আরও দুর্বল করে তোলে। তার আহ্বান, ধর্মনির্বিশেষে সকল আদিবাসীর ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, কারণ কাথলিক চার্চে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য নেই; সবাই মর্যাদা ও অধিকারে সমান।

আন্তর্জাতিক কাঠামোর প্রশ্ন

গারো সম্প্রদায়ের সদস্য সঞ্জীব দ্রং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে লেখালেখি ও আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে কথা বলেছেন।

তার ব্যাখ্যায় উঠে আসে “আদিবাসী” শব্দের আন্তর্জাতিক পটভূমি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক কার্যকরী দল গঠিত হওয়া থেকে শুরু করে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র পর্যন্ত। তার মতে, “নৃগোষ্ঠী” বা “উপজাতি” বললে কোনো আন্তর্জাতিক অধিকার কাঠামোর আওতায় পড়া যায় না, কিন্তু “Indigenous Peoples” পরিচয়ে সরাসরি সেই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও সরকার এই শব্দ ব্যবহার করেছিল, কিন্তু ২০১১ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর দ্বিধা তৈরি হয়। স্বীকৃতির অভাবে তিনি তিনটি বড় সংকট চিহ্নিত করেন ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় জটিলতা (যেমন মধুপুরে গারোদের বংশানুক্রমিক বসবাস সত্ত্বেও জমির কাগজ না থাকা), মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব, এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রতিনিধিত্বহীনতার ফলে সৃষ্ট পরিচয় সংকট।

মধুপুরের গারোদের বঞ্চনার ইতিহাস

থিওফিল নকরেক, লেখক-গবেষক

নকমান্দি গারো কমিউনিটি সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং লেখক-গবেষক থিওফিল নকরেক জোর দিয়ে বলেন, তারা কোনো জাতির “উপজাত” নন, বরং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী” নাম তাদের অবনমিত করে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে এই কনভেনশনগুলো আদিবাসী স্বীকৃতি দিয়েছে, যা দেশীয় আইনে প্রতিফলিত হলে ভূমির অধিকার সুরক্ষিত হবে। তিনি নির্দিষ্টভাবে জানান, মধুপুরের সিএস ও আরওআর রেকর্ডভুক্ত জমি ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে গেজেট করে বনবিভাগের নামে নেওয়া হয়েছে, এবং জলছত্র মিশনসহ সব জমির খাজনা গ্রহণ বন্ধ রয়েছে। কৃষিনির্ভর ও পূজা-পার্বণে কৃষি-কেন্দ্রিক এই জনগোষ্ঠীর কাছে জমি হারানো মানে জীবনের ভিত্তি হারানো। শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি কোটা বাতিল হওয়াকে তিনি আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। ১৬ জুলাই, ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় দাবিনামা উত্থাপনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সমাবেশ, সেমিনার ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের এই দাবি তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আইনি দৃষ্টিকোণ ও প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস

অ্যাডভোকেট প্রভাত টুডু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট প্রভাত টুডুর ব্যাখ্যায় “আদিবাসী” শুধু একটি পরিচয়বাচক শব্দ নয়, বরং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পূর্বপুরুষের ভূমির সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক, যেখানে “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী” কেবল জনসংখ্যার আকার নির্দেশ করে।

তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেন সমতলের আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারার বাস্তবায়ন। উদাহরণ হিসেবে তিনি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ বাগদা ফার্মের প্রায় ১৮৩২ একর জমির অবৈধ দখলের কথা উল্লেখ করেন, পাশাপাশি ইকোপার্ক ও সামাজিক বনায়নের নামে উচ্ছেদের ঘটনার কথাও বলেন। তার মতে, সরকারের কিছু আমলা ও বুদ্ধিজীবী ভুল বুঝিয়ে এই স্বীকৃতি ঠেকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখে, তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমতলের আদিবাসীদের সাক্ষাতে দাবি পর্যায়ক্রমে পূরণের যে আশ্বাস মিলেছে, তাকে তিনি আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। তিনি এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে গণ্য করে সবাই সমান মর্যাদায় বসবাস করবে।

সিলেটের পুঞ্জিতে ভূমি হারানোর শঙ্কা

ফ্লোরা বাবলি তালাং, অধিকারকর্মী

মৌলভীবাজারের বড়ইছড়া পুঞ্জির প্রধান ফ্লোরা বাবলি তালাং খাসিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপে অংশ নেন। তার বক্তব্যে উঠে আসে সিলেট অঞ্চলের বিশেষ বাস্তবতা, পাহাড়, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবিকা, অথচ প্রথাগত ভূমি অধিকারের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই।

তিনি ব্যাখ্যা করেন, কমিউনিটি-ভিত্তিক যৌথ ভূমি ব্যবস্থার কোনো দলিলপত্র না থাকায় একই জমি নিয়ে একাধিক পক্ষ দাবি করে বসে। কখনো বন বিভাগ সংরক্ষিত বন বলে, কখনো জেলা প্রশাসন খতিয়ানভুক্ত জমি বলে, আবার কোথাও চা-বাগানকে ইজারা দেওয়া হয়। জিমাই পুঞ্জির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের বসতি সত্ত্বেও চা-বাগান কর্তৃপক্ষ এখন সেই জমি নিজেদের দাবি করছে এবং তাদের লাগানো গাছ কাটার চেষ্টা করছে। পানগাছের মতো অর্থনৈতিক সম্পদ চুরি হওয়া আর উচ্ছেদের আতঙ্ক তাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। তার বিশ্বাস, সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে মালিকানা নিশ্চিত হবে এবং সরকার ইচ্ছামতো উন্নয়ন প্রকল্প চাপিয়ে দিতে পারবে না।

ভাষা, প্রতিযোগিতা ও প্রান্তিকতা

পিউস নানোয়ার, চট্টগ্রাম কারিতাস

চট্টগ্রাম কারিতাসের এবং ক্ষুদ্র খাড়িয়া সম্প্রদায়ের সদস্য পিউস নানোয়ার একটি ভিন্ন কোণ থেকে বিষয়টি তুলে ধরেন শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বাস্তবতা। তার মতে, বাংলা যাদের কাছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা সেই আদিবাসীদের জন্য একজন বাঙালির সমান সুযোগে প্রতিযোগিতা করা কঠিন। তাই তিনি রিজার্ভেশন বা বিশেষ সুবিধার কার্যকর প্রয়োগের পক্ষে কথা বলেন।

তিনি স্পষ্ট করেন, আদিবাসী পরিচয় নির্ভর করে না বসবাসের সময়কালের ওপর, বরং নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য লালনের ওপর। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের চা-বাগান-নির্ভর খাড়িয়া সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্বলতা ও ধর্মান্তরের কারণে সারনা ঐতিহ্যের ক্ষয়ের কথাও তিনি তুলে ধরেন। প্রকৃতিনির্ভর সরল জীবনযাপনে তিনি গর্ববোধ করেন, তবে সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা ও শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবকে তিনি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেন। আগামী এক দশকে তার প্রত্যাশা, তাদের সমাজ আরও সংগঠিত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌছাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কণ্ঠস্বর - 'অধিকার ও আত্মমর্যাদা খর্ব হয়'

অংকন চাকমা

খাগড়াছড়ির বাসিন্দা, ৩০ বছর বয়সী অংকন চাকমার বক্তব্যে উঠে আসে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, লুসাই, পাংখোয়া, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল দাবি। তিনি বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পূর্ণ আদিবাসী স্বীকৃতির প্রত্যাশা প্রকাশ করেন।

তার যুক্তি, "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" বা "উপজাতি" পরিচয়ে ঐতিহাসিক অধিকার ও আত্মমর্যাদা খর্ব হয়, যেখানে "আদিবাসী" পরিচয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সঙ্গে জড়িত। সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলে রাষ্ট্রের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হবে বলে তিনি মনে করেন, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের ভূমি বিরোধ নিরসনেও এই স্বীকৃতি সহায়ক হতে পারে। জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্রসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কাঠামোয় তাদের প্রতিনিধিত্ব আরও কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

'আমি গর্বের সঙ্গে বহন করছি আমার পরিচয়'

কণিকা ত্রিপুরা

বান্দরবানের মেয়ে, বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত, কণিকা ত্রিপুরার বক্তব্যে উঠে আসে ব্যক্তিগত পরিচয়ের গল্প। তার মতে, সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সমাধান হবে তা হলো পরিচয়ের সংকট। আদিবাসী নাকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, এই বিভ্রান্তি দূর হবে।

তিনি তুলনা টানেন মুক্তিযুদ্ধ বা বাঙালি সংস্কৃতি যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তেমনি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষাও সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়া উচিত, যাতে তারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হারিয়ে না যান। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি বলেন, শিক্ষাজীবন ও কর্মক্ষেত্রে তিনি সবসময় গর্বের সঙ্গে নিজেকে "আদিবাসী নারী" ও "ত্রিপুরা আদিবাসী" হিসেবে পরিচয় দেন। তার কাছে এই পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস। প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাকে নম্র করেছে এবং প্রতিযোগিতামূলক জীবনের বাইরে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

একটি বিষয় স্পষ্ট "আদিবাসী" শব্দটি শুধু একটি নামকরণের প্রশ্ন নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূমির অধিকার, সাংস্কৃতিক টিকে থাকা, শিক্ষা-কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ এবং সর্বোপরি আত্মমর্যাদার লড়াই। সংসদ সদস্য থেকে ধর্মীয় নেতা, আইনজীবী থেকে তৃণমূল কর্মী প্রত্যেকের বক্তব্যে ফিরে ফিরে এসেছে একটি অভিন্ন সুর: "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" পরিচয় তাদের ইতিহাস ও অস্তিত্বকে যথাযথভাবে ধারণ করে না, আর সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাবে তারা ভূমি হারাচ্ছেন, ভাষা-সংস্কৃতি হারাচ্ছেন, এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে পড়ছেন।

তবে এই আলোচনায় আশার আলোও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়, সরকারের নীতিদলিলে নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গে ইতিবাচক উল্লেখ, এসব ইঙ্গিত দেয় যে সংলাপের দরজা এখনও খোলা। একই সঙ্গে সঞ্জীব দ্রংয়ের মতো অধিকারকর্মীরা মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক অধিকার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হতে হলে "আদিবাসী" পরিচয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা আমাদের একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়, একটি রাষ্ট্র কি তার ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দাদের নিজস্ব পরিচয়ে ডাকতে পারে না? বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে, পারস্পরিক আস্থা ও সংলাপের মাধ্যমে এই প্রশ্নের একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করাই এখন সময়ের দাবি।

আদিবাসী দিবসঃ ‘সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের আহ্বান’

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হলো বিশ্বজুড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি উদ্‌যাপন ও তাদের প্রতি বৈষম্য বিলোপের একটি শক্তিশালী আহ্বান। প্রতি বছর ৯ আগস্ট বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালন করা হয়। সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গুরুত্ব দেওয়া এই দিবসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি অধিকার, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ও আইনের সুরক্ষা প্রদান করা এবং তাদের সংস্কৃতির সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধীর কথাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেছেন যে, “একটি জাতির সংস্কৃতি তার মানুষের হৃদয় ও আত্মায় বাস করে।” তাই বিশ্বব্যাপী এই “আদিবাসী” দিবসটি পালন করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ভাই-বোনদের প্রতি সম্মান জানানো হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতিসংঘ এই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে।

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেছেন যে, “আদিবাসীরা বিশ্বের অনন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। তাঁদের মর্যাদার সঙ্গে এবং নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।” আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সংস্কৃতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণ: আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য, পোশাক, নৃত্য, গান-বাজনা ও জীবনধারা রক্ষায় উৎসাহ দেয়। সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার বার্তা দিয়ে বৈষম্য কমাতে আহ্বান করে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি নির্ভর জীবনধারা পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

পবিত্র বাইবেলে “আদিবাসী” শব্দটা সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি। তবে বাইবেল জোর দিয়ে স্মরণ করায় যে, সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ও ঈশ্বর কোন জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাত করেন না। তাই আদিবাসীসহ সব জনগোষ্ঠীর মানুষই সমান মর্যাদা, অধিকার ও সম্মানের অধিকারী। যিশু কিন্তু অন্যভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা জাতি, গোষ্ঠী, ছোট-বড় সকলকে ভালোবাসি, সম্মান করি, ন্যায়বিচার করি, অধিকার প্রদান করি। তিনি যেমন বলেছেন যে, “তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসো” *(মথি ২২:৩৯)*। এখানে প্রতিবেশি বলতে যে কোন মানুষকে বোঝানো হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয় নয়। “ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান নামে পরিচিত হবে” *(মথি ৫:৯)*, “তোমরা যা চাও যে লোকেরা তোমাদের প্রতি করুক, তোমরাও তাদের প্রতি তাই করো” *(মথি ৭:১২)*, “অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো” *(মথি ২৮:১৯)*। এছাড়াও যিশু *(লূক ১০:২৫-৩৭)* সামারীয়র কথা বলেছেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষও আমাদের প্রতিবেশি এবং ভালোবাসার যোগ্য। যিশুর শিক্ষা অনুসারে আদিবাসীসহ সব মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও যিশুর ভালোবাসা এবং পরিত্রাণ সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত, যা সর্বজাতির মধ্যে সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের আহ্বান রাখে। যিশুর শিক্ষার সাথে একতা প্রকাশ করে বান কি-মুন বলেছেন যে, “টেকসই উন্নয়নের পথে আদিবাসীরা অপরিহার্য অংশীদার।”

আদিবাসীরা একটি দেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনধারা রয়েছে। তারা নিজেরা তা রক্ষা ও বহন করে। তাই তাদের করণীয় বা এমন কিছু দায়িত্ব ও উদ্যোগ রয়েছে যা, তাদের নিজস্ব পরিচয়, অধিকার, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে থাকে, যেমন–নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা এবং নতুন প্রজন্মকে তা শেখানো। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা। ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা, যাতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। আইনসম্মত উপায়ে অধিকার আদায়ে সচেতন হওয়া, যেমন ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের বিষয়। নারী ও শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে আদিবাসী সমাজের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যুবসমাজকে নেতৃত্ব, শিক্ষা ও সামাজিক সেবায় উৎসাহিত করা। সরকার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সংলাপ ও সহযোগিতা বজায় রেখে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী আদিবাসীসহ সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, সমতা ও মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই আদিবাসী সমাজেরও উচিত ঈশ্বরপ্রদত্ত মর্যাদা রক্ষা করে ঐক্য, সততা, পরিশ্রম ও পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজ গড়ে তোলা। “বিশ্ব আদিবাসী দিবস” পালনের মধ্যদিয়ে সকলের সাথে আদিবাসীদেরও সচেতনভাবে নিজের জাতিকে রক্ষা করতে হবে।

পরিশেষে বলতে পরি যে “বিশ্ব আদিবাসী দিবস” আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংস্কৃতি, পরিচয় ও মানবাধিকার রক্ষায় সবার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রচেষ্টা সকল শ্রেণির মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও বিশেষ করে আদিবাসী ভাই-বোনদেরও নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা, একতা, নিজস্ব অধিকার আর্জন করা ও যুবাদের মধ্যে জাগরণ আনার প্রচেষ্টা সর্বদা চালিয়ে যেতে হবে। এ পৃথিবীতে আমরা সবাই আদিবাসী। কারণ এই জগতের কোন কিছু আমরা সৃষ্টি করিনি বরং সৃষ্টিকর্তার প্রেম ও ভালোবাসর দান হিসেবে পেয়েছি। এ সবই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন পরস্পরকে সম্মান করার ও সমতা, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই দিনটি আমাদের মধ্যে সেই চেতনা, প্রেরণা দান করুক, সেই কামনা করি। “আদিবাসী দিবসে ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান হলো, ‘সমতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। ‘শিক্ষা মনোবিদ্যা’ লেখক, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী. ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯,

২। খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে “ঐশবাণীধ্যান” সাধু বেনেডিক্ট মঠ, মহেশ্বরপাশা, খুলনা

৩। ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল, বিশ্বাসের মানুষ, লেখক, জীন গসেলিন আরনল্ড

একজন আদিবাসী আমার প্রিয়জন, কাছের জন ও দেশের সম্পদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমার শিশু ও শৈশবকালে আমাদের বাড়ি ও গ্রামে বেশ কয়েকজন গারো ভাইদের দেখেছি। তাদের দেখে একটু ব্যতিক্রম মনে হতো। বিশেষভাবে তাদের গঠন ও ভাষা ছিল আলাদা। আমাদের স্থানীয় বাংলা বুঝতে তাদের হয়তো কষ্ট হতো। কিন্তু তারপরেও সকলের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতো। আমাদের বাড়িতে পরপর বেশ কয়েক বছর দু'জন কাজ করতো। আমরা ছোটরা তাদেরকে দাদা বলেই ডাকতাম। তারাও আমাদেরকে খুব আপন করে নিয়ে সবকিছু করতো। তারা শুধু কাজ করতো তা-ই নয়; তারা একসাথে হাসি-ঠাট্টা, দুষ্টুমি ও লেখাধূলাও করতো। আমরা ছোটরা বিপদে পড়লে তারা রক্ষা করতে এগিয়ে যেতো প্রথম আর বড়দের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতো। এমনিভাবে ওদেরকে আমরা দেখতাম আমাদের কাছেরজন ও প্রিয়জনরূপে। মা. দাদা- বৌদিরা সবসময় খেয়াল রাখতো ওরা ঠিকমতো খেয়েছে কিনা।

শৈশবকালে গারোদের দেখে জেনেছি যে, আমাদের দেশে অনেক রকম মানুষই আছে। হাইস্কুলে পড়াকালীন নাগরী হোস্টেলে যাই। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ছেলেরা একসাথে থাকি ও পড়াশুনা করি। খ্রিস্টান ছেলেরাও বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই পরিচয় হয় পলাশ মারাণ্ডী নামে জয়পুরহাটের একজন ছেলের সাথে। ওর দিদি জয়পুরহাটে খ্রিস্টান মেডিকেলের একজন স্টাফ নার্স ছিলেন, যিনি আমাদের রাঙ্গামাটিয়ার একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেসুবাদে পলাশও আমার সাথে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়। পড়াশুনায় বেশ ভালো পলাশ, আমিও খারাপ ছিলামনা। তাই বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমরা পরস্পরকে বেশ সহযোগিতা করতাম এবং বাজার ও হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতাম। পরে আমাদের সাথে আরেকজন যুক্ত হয়। ও সিলেটের কুলাউড়ার এলিয়াস বারে। দেখতে শুনতে ছোটখাট ও ধীরস্থির। এলিয়াস দেখতে যেমন ফর্সা পলাশ ঠিক তার উল্টো। আর আমি মাঝামাঝি। 'মারাণ্ডী' বা 'বারে' কি তা জানার জন্য কৌতুহল তেমন জন্মেনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমার 'রিবেরু'র মতো ওদের টাইটেল ঐগুলো। টাইটেলের ভিন্নতা আমাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়নি বরং আরো বেশি কাছের ও প্রিয় হয়ে ওঠেছি।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশ করে দেখি, বাঙালিদের থেকে বেশি গারোরা। তবে সেকি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। সিলেট থেকে আসা কিছু ছেলেকে দেখে মনে হয়েছে না বাঙালি না গারো। এদের কারো টাইটেল টপ্য, কারো ক্রুন্দ, কারো ইন্দোয়ার, কারো বা তংপেয়ার। এমনি বাহারি মানুষের সমারোহে বান্দুরা সেমিনারী ও স্কুল ছিল এক ফুলের বাগান। স্কুলের স্যাররাও বলতেন, ময়মনসিংহ ও সিলেটের ছেলেদের জন্য আমরা কতকিছু জানতে পারি। আর ওরা ক্রীড়া, খেলাধূলা ও পড়াশুনায়ও আমাদের স্কুলের জন্য কত সুনাম বয়ে আনে। আমি নিজেও দেখেছি আমাদের সময়ে গান-বাজনায়, খেলাধূলায় ময়মনসিংহ ও সিলেটের ছেলেরাই এগিয়ে। পরবর্তীতে ১৯৯২ ও ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে গিয়ে ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভাষার মানুষের সাথে মিলি। কিন্তু ঐ ভাষার মানুষ যারা আমাদের সাথে ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু কমেনি। বরং তাদের মাধ্যমে ঐ মানুষদেরও কাছের মানুষ হতে পেরেছি ও তারাও আমাদের প্রিয়জন হয়েছে।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে আমরা ৬জন দিনাজপুরের কানাগাড়ি নামক স্থানের বাজারের এক ছোট হোটেলে কিছু খেতে ঢুকি। আমরা ৩জন বাঙালি, ১জন গারো ও ২জন সান্তাল। হোটেলের কর্মচারীরা ৪জনকে সুন্দর কাপ দিয়ে চা দেয় এবং সান্তাল ২ জনকে ভাঙ্গা মাটির পেয়ালায় চা দেয়। আমরা ৪জন প্রতিবাদ করি। কেন ওরা হোটেলে বসে আমাদের মতো করে খেতে পারবে না - জানতে চাই। হোটেল ম্যানেজার বলে, আমাদের এ এলাকায় এটিই নিয়ম। আমরা বলি, আমরা মানি না এই নিয়ম, আমরা সবাই একসাথে চলি, একসাথে খেলি, একসাথে ঘুরাফেরা করি। আপনারাওতো এদের সাথে খেলাধূলা করেন; কিন্তু তারপরও আপনারা কেন এদেরকে আলাদা চোখে দেখেন? আমাদের মতো করেই ওদেরকে ভালো কাপে ও হোটেলে চা দিতে হবে। আমাদের চেঁচামেচি শোনে ঐ সময়ের চেয়ারম্যানের ভাই এগিয়ে আসে, আমাদের চিনতে পারে। সে জানে আমরা সাধারণত কোন ব্যাপারে ঝগড়া করিনা। তাই ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাইলে আমরা বিষয়টি খুলে বলি। সে-ও কিছুটা ইতস্তত করতে থাকে। একপর্যায়ে আমাকে বলে, চলেন আমরা বাইরে গিয়ে চা খাই। আমরা হোটেল ম্যানেজারকে বলি, আমাদের সবাইকে একভাবে দেখেননি বলে আমরাও আপনার হোটেলে আর খাচ্ছি না। ঐদিন উপস্থিত সকলেই বুঝতে পেরেছিল, ঐ আদিবাসী ছেলেরাও আমাদের আপনজন।

সময় অনেকটা গড়িয়ে গেছে। দেশও অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। তবে আদিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা প্রশ্নবোধক। তবে বাংলাদেশ মণ্ডলী সবসময়ই আদিবাসীদের পাশে থেকেছে। তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। ব্যক্তি বিশেষে হয়তো কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে কিন্তু মণ্ডলী সর্বদা আদিবাসী সত্তা ও তাদের নিজস্বতাকে সম্মান করেছে। তার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই, মণ্ডলীর পক্ষ থেকেই বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষায় বই প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। তবে শুধু কোটা নয় মেধা দিয়েই তারা এগিয়ে আসছে।

একসময় যে আদিবাসীদের মূলধারার জনগণ একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতো আজ তারাই তাদের সাথে পথ চলছে। এটি একটি আশাপ্রদ দিক। তবে তা করছে নিজেদের স্বার্থের কারণে। মন থেকে যে করছে তা বলা যাবে না। কেননা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীদেরকে হেয় চোখে দেখা হয়। তবে আশাপ্রদ দিক যে, আদিবাসীরা দেশের সম্পদে পরিণত হচ্ছেন। এরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে অংশ নিচ্ছেন কঠোর পরিশ্রম ও প্রকৃতিকে সুরক্ষা করার মধ্যদিয়ে। ইদানিং কালের কয়েকজন আদিবাসীর কথা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি যারা দেশের সম্পদে পরিণত হয়েছেন।

প্রেনচ্যুং ম্রো: প্রেনচ্যুং ম্রো বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড় অঞ্চলের একজন স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী ফুটবলার। তিনি ১ মিনিটে সর্বোচ্চ ২০৮ বার ফুটবলে টোকা (toe taps) দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় ফুটসাল দলের হয়েও খেলেছেন। ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তান প্রেনচ্যুং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পড়াশুনা করছেন।

ঋতুপর্ণা চাকমা: ঋতুপর্ণা একজন বাংলাদেশী পেশাদার নারী ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দল ও পারো এফসিতে মধ্যমাঠের খেলোয়াড়। ঋতুপর্ণা চাকমা ৩০ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদিবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। চার বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে ঋতু সবার বড়। তার পিতা ও ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর, তার মা কালাসোনা চাকমা ও বোনেরা তাকে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করেন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে খেলার অফার পেয়েছেন ঋতুপর্ণা।

(বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দর্শন দানের মাধ্যমে ক্যাটালিনা রিভাস এর কাছে পবিত্র খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সিস্টার রুমা গমেজ

বলিভিয়ার কোচাবাম্বার ক্যাটালিনা রিভাস বর্তমানে মেক্সিকোর ইউকাতানের মেরিডায় বসবাস করছেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যিশু, কুমারী মারীয়া এবং স্বর্গদূতদের কাছ থেকে স্বর্গীয় বার্তা লাভ করেন। তাঁর বিশপ রেনে ফার্নান্দেজ আপাজা এই বার্তাগুলোর সত্যতা যাচাই করে তাঁর অনুমোদন (ইম্প্রিমাতুর) দিয়েছেন। নিচের পাঠ্যটি হলো "দ্য হোলি মাস" (পবিত্র খ্রিস্টযাগ) নামক পুস্তিকার একটি অনুলিপি, যেখানে আমাদের প্রভু যিশু এবং ধন্যা কুমারী মারীয়া ক্যাটালিনাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে পবিত্র খ্রিস্টযাগের সময় আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে এবং কীভাবে আমাদের এই মহান রহস্যগুলোর ওপর আরও বেশি ভক্তি সহকারে অংশগ্রহণ ও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

মেক্সিকোর আর্চডায়োসিসের 'বিশ্বাস শিক্ষা কমিশন'-এর ব্রাদার ড্যানিয়েল গ্যাগনন এই বইটি সম্পর্কে লিখেছেন: "মণ্ডলীর বিশ্বাস বা রীতিনীতির বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কিছুই আমি এই বইটিতে খুঁজে পাইনি। এর অলৌকিক বা স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা আমার কাজ নয়; তবুও, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার জন্য আমি এটি পড়ার সুপারিশ করছি।"

পবিত্র খ্রিস্টযাগের ওপর ক্যাটালিনার সাক্ষ্য:

এক অপূর্ব ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে প্রভু যিশু এবং কুমারী মারীয়া প্রথমে আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে হৃদয় দিয়ে জপমালা প্রার্থনা করতে হয় এবং ঈশ্বর ও আমাদের ধন্যা মাতার সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তগুলোকে গভীরভাবে ধ্যান ও উপভোগ করতে হয়। তাঁরা আমাদের ভালো করে পাপস্বীকার করার উপায়ও শিখিয়েছেন এবং এই লেখাটিতে পবিত্র খ্রিস্টযাগের সময় কী ঘটে এবং কীভাবে তা হৃদয় দিয়ে যাপন করতে হয়, সেই শিক্ষা দিয়েছেন।

ঈশ্বরের মহিমা এবং যারা প্রভুর কাছে নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে চান তাদের পরিত্রাণের জন্য আমি এই সাক্ষ্য সমগ্র বিশ্বের কাছে দিতে বাধ্য এবং তা দিতে ইচ্ছুক। এটি এই জন্যেও দেওয়া হয়েছে যাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অনেক আত্মা খ্রিস্টের প্রতি তাদের ভালোবাসার আগুনকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন। বিশেষ করে সেই যাজকবৃন্দ, যাদের হাতে রয়েছে আমাদের এই পৃথিবীতে খ্রিস্টকে নিয়ে আসার ক্ষমতা, যাতে করে তিনি আমাদের আত্মিক খাদ্য হতে পারেন। এটি অন্যান্যদের জন্যও দেওয়া হয়েছে যাতে তারা যাজকীয় জীবনের "নিয়মিত অভ্যাস" হিসেবে খ্রিস্টকে গ্রহণ করার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং প্রেমের সাথে তাদের প্রতিদিনের মিলনের বিস্ময়কে পুনরায় অনুভব করতে পারেন। যেন সারা বিশ্বের খ্রিস্টবিশ্বাসী সাধারণ ভাই-বোনেরা তাদের হৃদয় দিয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনাটি যাপন করতে পারেন: যা হলো পবিত্র খ্রিস্ট প্রসাদীয় উৎসব।

সেদিন ছিল কুমারী মারীয়ার কাছে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের আগমন বার্তার (দূত সংবাদ পর্ব) আগের সন্ধ্যা। আমাদের প্রার্থনা দলের সদস্যরা পাপস্বীকারের জন্য গিয়েছিলেন। দলের কয়েকজন নারী সেদিন তা করতে পারেননি, তাই তারা পরের দিন মিসার আগে পাপস্বীকার করার সময় রেখে দিয়েছিলেন।

পরের দিন যখন আমি একটু দেরিতে গির্জায় পৌঁছালাম, তখন আর্চবিশপ এবং যাজকগণ ইতোমধ্যেই পবিত্র উপাসনার জন্য শোভাযাত্রা করে আসছিলেন। ধন্যা কুমারী মারীয়া তাঁর সেই মৃদু ও নারীসুলভ কণ্ঠে বললেন, যা মানুষের আত্মাকে মধুরতায় ভরিয়ে দেয়, "আজ তোমার জন্য শেখার দিন, এবং আমি চাই তুমি খুব মনোযোগ দাও কারণ আজ তুমি এক মহান বিষয়ের সাক্ষী হতে যাচ্ছ। আজ তুমি যা কিছু অনুভব করবে, তা তোমাকে সমস্ত মানবজাতির সাথে ভাগ করে নিতে হবে।" কোনো কারণ না বুঝেই আমি গভীরভাবে আপ্লুত হলাম, তবে খুব মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রথম যে জিনিসটি আমি লক্ষ্য করলাম তা হলো খুব সুন্দর কণ্ঠের একটি গায়কদল গান গাইছিল, যা মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গীতটি কাছে আসছিল, এবং তারপর বাতাসের শব্দের মতো আবার দূরে চলে যাচ্ছিল। আর্চবিশপ পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করলেন এবং যখন তিনি (ক্ষমাভিক্ষা) অনুতাপের রীতিতে পৌঁছালেন, তখন ধন্যা কুমারী বললেন: "তোমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রভুর কাছে তোমার সেইসব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও যা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। এইভাবে, তুমি পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়ার এই বিশেষ সুযোগে মর্যাদাপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।"

আমি এক মুহূর্তের জন্য ভাবলাম: "আমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে আছি; গত রাতেই তো আমি পাপস্বীকার করেছি।" তিনি উত্তর দিলেন: "তুমি কি মনে করো গত রাত থেকে তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করোনি? তোমাকে কয়েকটা জিনিস মনে করিয়ে দিই। তুমি যখন এখানে আসার জন্য রওনা হচ্ছিলে, তখন তোমার বাড়ির কাজের মেয়েটি তোমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। যেহেতু তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল এবং তুমি তাড়াহুড়ো করছিলে, তাই তুমি তাকে খুব একটা সদয়ভাবে উত্তর দাওনি। সেখানে তোমার ভালোবাসার অভাব ছিল, আর তুমি বলছ তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করোনি...?

"এখানে আসার পথে একটা বাস তোমার লেনের সামনে চলে এসেছিল এবং তোমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই দিচ্ছিল। তুমি সেই বেচারা লোকটির প্রতি অত্যন্ত অনুচিত ভাষায় মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছ, অথচ তখন তোমার প্রার্থনা করা এবং খ্রিস্টযাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত ছিল। তুমি ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়েছ এবং তোমার শান্তি ও ধৈর্য হারিয়েছ। আর তুমি বলছ তুমি প্রভুকে আঘাত করোনি? "তুমি একেবারে শেষ মুহূর্তে এসেছ যখন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের জন্য যাজকদের শোভাযাত্রা ইতোমধ্যেই বের হয়ে এসেছে... এবং তুমি কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এতে অংশ নিতে যাচ্ছ..."

আমি উত্তর দিলাম, "ঠিক আছে, আমার স্বর্গীয়া মা জননী, আমাকে আর কিছু বলবেন না। আপনাকে আর কোনো কিছু মনে করিয়ে দিতে হবে না, কারণ আমি দুঃখ এবং লজ্জায় মরে যাচ্ছি।"

মারীয়া আরো বলেন, "তোমরা সবাই কেন শেষ মুহূর্তে গির্জায় এসে পৌঁছাও? তোমাদের আরও আগে আসা উচিত ছিল যাতে প্রার্থনা করতে পারো এবং পবিত্র আত্মাকে পাঠানোর জন্য প্রভুর কাছে আবেদন করতে পারো। পবিত্র আত্মা যেন তোমাদের শান্তির চেতনা দান করেন এবং এই জগতের মোহ, চিন্তা, সমস্যা এবং মনোযোগের বিঘ্ন থেকে তোমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যাতে তোমরা এই অত্যন্ত পবিত্র মুহূর্তটি যাপন করতে পারো। অথচ, তোমরা ঠিক তখন এসে পৌঁছাও যখন উদ্‌যাপন শুরু হতে যাচ্ছে এবং তোমরা এতে অংশগ্রহণ করো যেন এটি সাধারণ কোনো ঘটনা, কোনো আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ছাড়াই। কেন? এটিই তো অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা এমন একটি মুহূর্ত যাপন করতে যাচ্ছ যখন পরমেশ্বর ঈশ্বর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দিচ্ছেন, অথচ তোমরা তা মূল্যায়ন করতে জানো না।"

এটুকুই যথেষ্ট ছিল। আমার এত খারাপ লাগছিল যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমার কাছে অনেক কারণ ছিল। এটি কেবল সেই দিনের অপরাধের জন্যই ছিল না, বরং অন্যান্য অনেক মানুষের মতো আমি কতবার যাজকের উপদেশবাণী শেষ হওয়া পর্যন্ত গির্জার বাইরে অপেক্ষা করেছি, তার জন্যও। এটি সেইসব সময়ের জন্যও ছিল যখন আমি জানতাম না বা বুঝতে চাইতাম না যে সেখানে উপস্থিত থাকার অর্থ কী, এবং সেইসব সময়ের জন্য যখন হয়তো আমার আত্মা আরও গুরুতর পাপে পূর্ণ ছিল, তবুও আমি পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম।

সেদিন ছিল একটি উৎসবের দিন, এবং 'মহিমা কীর্তন' (জয়পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকের জয়) পাঠ করার কথা ছিল। আমাদের মাতা মারীয়া বললেন: "তোমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে পবিত্র ত্রিত্বের মহিমা ও ধন্যবাদ কীর্তন করো, একজন সৃষ্টি হিসেবে তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"

সেই মহিমা কীর্তনটি কতই না আলাদা ছিল! হঠাৎ আমি নিজেকে আলোয় ভরা এক দূরবর্তী স্থানে ঈশ্বরের সিংহাসনের রাজকীয় উপস্থিতির সামনে দেখতে পেলাম। গভীর ভালোবাসার সাথে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম এবং বারবার বলতে লাগলাম: "আপনার মহতী গৌরবের জন্য আমরা আপনার স্তব করি, আপনার ধন্যবাদের গুণগান করি, আপনার আরাধনা করি, আপনার গৌরব কীর্তন করি, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, হে প্রভু ঈশ্বর, স্বর্গীয় রাজন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর।" আর আমি পিতার সেই পরম দয়াময় মুখমণ্ডল স্মরণ করলাম। "হে প্রভু যিশু খ্রিস্ট, পিতার একমাত্র পুত্র, প্রভু ঈশ্বর, ঈশ্বরের মেষশাবক, আপনি জগতের পাপ হরণ করেন..." আর যিশু আমার সামনে ছিলেন, তাঁর সেই পরম কোমলতা ও দয়ায় ভরা মুখ নিয়ে... "কারণ আপনিই একমাত্র পবিত্র, আপনিই একমাত্র প্রভু, আপনিই পবিত্র আত্মার সাথে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর...", সুন্দর প্রেমের ঈশ্বর। তিনি, যিনি সেই মুহূর্তে আমার সমগ্র সত্তাকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন...

এবং আমি প্রার্থনা করলাম: "প্রভু, সমস্ত মন্দ আত্মা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমার হৃদয় আপনারই। হে আমার প্রভু, আপনার শান্তি আমার মধ্যে প্রেরণ করুন যাতে আমি খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে সর্বোত্তম আত্মিক পুষ্টি লাভ করতে পারি এবং আমার জীবন যেন সর্বোত্তম ফল উৎপন্ন করতে পারে। হে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা, আমাকে রূপান্তরিত করুন, আমার ভেতরে কাজ করুন, আমাকে পরিচালিত করুন। হে ঈশ্বর, আপনার আরও ভালো সেবা করার জন্য আমার যে আত্মিক গুণ বা দানসমূহ প্রয়োজন, তা আমাকে দিন!"

ঐশবাণী পাঠ

যখন 'ঈশ্বরের বাণী পাঠের মুহূর্তটি এলো, তখন কুমারী মারীয়া আমাকে দিয়ে এই প্রার্থনাটি পুনরাবৃত্তি করালেন: "প্রভু, আজ আমি আপনার বাক্য শুনতে চাই এবং প্রচুর ফল উৎপন্ন করতে চাই। আপনার পবিত্র আত্মা যেন আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর পরিষ্কার করেন যাতে আপনার বাক্য আমার মাঝে বৃদ্ধি পায় ও বিকশিত হয় এবং আমার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে যেন তা সুসজ্জিত হতে পারে।" আমাদের মাতা মারীয়া বললেন: "আমি চাই তুমি পাঠগুলোর প্রতি এবং যাজকের সমস্ত উপদেশবাণীর প্রতি মনোযোগী হও। মনে রেখো বাইবেল বলে, ঈশ্বরের বাক্য ফল ধারণ না করে শূন্য হাতে ফিরে আসে না। তুমি যদি মনোযোগী হও, তবে তুমি যা কিছু শুনেছ তার কিছু অংশ তোমার মধ্যে থেকে যাবে। সারা দিন ধরে তোমার সেই বাক্যগুলো মনে করার চেষ্টা করা উচিত যা তোমার মনে রেখাপাত করেছে। কখনো কখনো একটি দুটি পদ হতে পারে, অন্য সময় পুরো মঙ্গলসমাচারের পাঠ হতে পারে, অথবা হয়তো কেবল একটি শব্দ। দিনের বাকিটা সময় সেগুলোর স্বাদ আস্বাদন করো, এবং তখন তা তোমার জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। কারণ ঈশ্বরের বাক্যকে তোমার জীবনে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেওয়াই হলো জীবন পরিবর্তনের একমাত্র উপায়। "আর এখন, প্রভুকে বলো যে তুমি এখানে তাঁর কথা শোনার জন্য প্রস্তুত আছ, তুমি চাও আজ তিনি তোমার হৃদয়ের সাথে কথা বলুন।"

আরও একবার আমাকে ঈশ্বরের বাক্য শোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং এতদিন ধরে আমার হৃদয় এত কঠিন হয়ে থাকার জন্য আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। একই সাথে ক্ষমা চাইলাম আমার সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেন তাদের রবিবারে পবিত্র মিসায় যেতে হবে কারণ এটি মণ্ডলীর নির্দেশ (বাধ্যবাধকতা), ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বা তাঁর ঐশরিক উপস্থিতিতে পূর্ণ হওয়ার তাড়না থেকে নয়। আমি কেবল বাধ্যবাধকতার খাতিরে কত শত খ্রিস্ট প্রসাদীয় উদ্‌যাপনে যোগ দিয়েছি এবং এই কারণে নিজেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত মনে করেছি কিন্তু আমি তো তখনো তা অন্তর দিয়ে যাপন করিনি, আর পাঠ কিংবা যাজকের উপদেশবাণীর প্রতিও কখনো মনোযোগ দিইনি!

আমার এই অজ্ঞতার কারণে জীবনের এতগুলো বছর যে অপচয় হয়েছে, তার জন্য আমি গভীর বেদনা অনুভব করলাম! খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ আমাদের কতই না ভাসাভাসা হয় যখন আমরা কেবল কারও বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, কিংবা সমাজে নিজেদের মুখ দেখানোর জন্য গির্জায় যাই! আমাদের মণ্ডলী এবং সংস্কারগুলো সম্পর্কে আমাদের কতই না অজ্ঞতা! এই নশ্বর পৃথিবীর জাগতিক বিষয়গুলো শেখার জন্য আমরা কত সময় নষ্ট করি, যা এক মুহূর্তে বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং জীবনের শেষ সময়ে আমাদের অস্তিত্বকে এক মিনিটের জন্যও বাড়াতে সাহায্য করবে না! অথচ, যা আমাদের এই মর্ত্যের বুকেই স্বর্গের স্বাদ এনে দেয় এবং অনন্ত জীবন দান করে, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না! আর আমরা কিনা নিজেদের সভ্য ও শিক্ষিত পুরুষ ও নারী বলে দাবি করি! *(চলবে)*

নারী ও শিশুর নিরাপত্তা: নীরবতা ভেঙে চাই এখনই পদক্ষেপ

নিকোলাস বিশ্বাস

নারী ও শিশু নির্যাতন কেবল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি কিংবা অপরাধের পরিসংখ্যানগত হিসাব নয়; এটি একটি সমাজের মানবিকতা, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধের এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে সামনে আসছে। শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, মানসিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, অপহরণ ও হত্যার মতো অপরাধগুলো আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে এক চরম নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন কোনো একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সবক্ষেত্রেই এ ধরনের অপরাধ অহরহ ঘটছে। অপরাধীরা বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, পারিবারিক বিরোধ, সামাজিক কুসংস্কার এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অসহায় ও দুর্বল মানুষদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। আমাদের সমাজে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত কারণে দুর্বল হওয়ায় অপরাধীরা প্রায়ই তাদের সহজ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা কেবল ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতা ও প্রবণতা

বিশ্বব্যাপী নারী ও শিশু নির্যাতনের পরিস্থিতি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দেও অত্যন্ত সংকটাপন্ন ও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন দেশে চলমান সশস্ত্র সংঘাত, সম্মুখসারিতে কাজ করা মানবসেবা ও সহায়তাকারী সংস্থাগুলোর তীব্র অর্থসংকট এবং লিঙ্গ সমতার অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কয়েক দশকের আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বিশ্বজুড়ে এখনো প্রায় প্রতি তিনজন নারীর একজন তার জীবন দশায় ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

এর পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর নির্যাতনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত হয়রানি ও হুমকির মাধ্যমে নারী সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, সামাজিক আন্দোলনকারী ও পরিচিত ব্যক্তিত্বদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান যৌন সহিংসতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি স্থানীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, অপরাধীদের প্রতি 'শূন্য-সহনশীলতা' নীতি কার্যকর করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসানের জন্য জোর দাবি জানিয়েছে।

দেশের বর্তমান বাস্তবতা ও চিত্র

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা মারাত্মকভাবে বাড়ছে। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ এবং শিশু মৃত্যুর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের নথি অনুযায়ী, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক মাসেই সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ২,০১১টি মামলা নিবন্ধিত হয়েছে - যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের পর গত নয় মাসের মধ্যে একক মাসে সর্বোচ্চ।

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে ১,৬২১ জন নারী ও কিশোরী সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১,০৪২। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এ ধরনের ঘটনা প্রায় ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম অর্ধে ৪৯০ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯৫ জন শিশু শারীরিক নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা অথবা যৌন নির্যাতনের পর করুণ পরিণতি হিসেবে প্রাণ হারিয়েছে।

এছাড়াও সংগৃহীত উপাত্তসমূহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে: ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৮৬ শতাংশ শিশু শৃঙ্খলার নামে শারীরিক সহিংসতার মুখোমুখি হয় এবং দেশের ৪৭.২ শতাংশ কিশোরীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ হয়ে যায়। এছাড়া প্রায় ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবন দশায় সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন।

তবে এ তথ্যগুলো মূল ঘটনার একটি অংশমাত্র। সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিশোধের ভয়, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং সামাজিক চাপের কারণে অধিকাংশ ভুক্তভোগী আইনি সহায়তা নিতে পারেন না এবং আদালতের বাইরে আপস করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশে ১০২টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং '১০৯ ও ১০৯২১' জাতীয় হেল্পলাইনের মতো আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে চরম দুর্বলতা রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নথিভুক্ত হওয়া ৫,৬০০টিরও বেশি যৌন সহিংসতার মামলার মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ মামলায় আসামির শাস্তি বা রায় কার্যকর হয়েছে।

জরুরী ও কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশকে অতিসত্ত্বর একটি ডেডিকেটেড 'শিশু বিষয়ক বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংস্কার করতে হবে এবং পেশাদার ও সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মী দল গঠন করতে হবে। সেই সাথে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বিত একটি কার্যকরী কর্মগোষ্ঠী গঠন করা প্রয়োজন, যা সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের মাধ্যমে অরক্ষিত নারী ও শিশুদের সুরক্ষা দেবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকে একটি স্থায়ী সুরক্ষা বলয়ে রূপান্তর করবে।

প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মানসিক প্রভাব

প্রযুক্তির বিকাশ অপরাধের ধরণ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে। স্মার্টফোন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট এখন সবার হাতে থাকায় যেকোনো নির্যাতনের ছবি ও ভিডিও তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অতীতেও সহিংসতা হতো, কিন্তু প্রযুক্তি অপ্রতুল থাকায় এত দ্রুত তা সামাজিক প্রভাব তৈরি করতে পারতো না। সামাজিক মাধ্যমে নির্যাতনের বিষয় ছড়ানোর দু'টি দিক রয়েছে:

ক) ইতিবাচক প্রভাব: অন্যায়ের ভিডিও বা ছবি জনমত গঠন করতে সাহায্য করে, অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।

খ) নেতিবাচক প্রভাব: সহিংসতার ভয়াবহ দৃশ্য বারবার দেখার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপ, আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে।

নারী ও শিশুদের ওপর এই মানসিক প্রভাব আরও দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর হয়। কোনো মা যখন একটি শিশুর ওপর নির্যাতনের ভিডিও দেখেন, তখন নিজ সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে তার মনে স্থায়ী শঙ্কা তৈরি হয়। একইভাবে, প্রকাশ্যে কোনো নারীকে লাঞ্ছিত হতে দেখলে অন্য নারীদের মনে ভয় জন্মায় এবং তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও চলাফেরা সংকুচিত করেন। এভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনাও প্রযুক্তি মারফতে পুরো সমাজে এক যৌথ মানসিক আঘাত ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে।

এছাড়া প্রযুক্তির অসচেতন ব্যবহার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন না রাখা, সংবেদনশীল ছবি বারবার পোস্ট করা কিংবা গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ভুক্তভোগী ও তার পরিবার দ্বিতীয়বারের মত সামাজিকভাবে হেনস্থা ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। প্রযুক্তি কেবল একটি মাধ্যম; তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সংবেদনশীলতা ও দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য।

রাজনৈতিক সংঘাত ও পারিবারিক সহিংসতা

দলীয় সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গণতান্ত্রিক চর্চায় মতাদর্শিক ভিন্নতা স্বাভাবিক, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ কখনোই কোনো ব্যক্তির ওপর অমানবিক অত্যাচারকে সমর্থন করতে পারে না।

গণপিটুনি, শারীরিক নির্যাতন, প্রকাশ্যে অপমান ও নৃশংসতা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে। ক্ষমতা প্রদর্শন ও রাজনৈতিক উদ্দেশে সহিংসতাকে যখন নিয়মিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন সমাজ ধীরে ধীরে সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। একসময় মানুষের এই কষ্ট দেখে সমাজ উদাসীন হয়ে পড়ে, যা একটি অসুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষণ।

একইভাবে, পারিবারিক সহিংসতা একটি মারাত্মক কিন্তু গোপনীয় সমস্যা। পরিবার ও সমাজ প্রায়ই একে 'ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়' বলে এড়িয়ে যায়। স্ত্রীর ওপর নির্যাতন, শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নিষ্ঠুরতা এবং বয়োবৃদ্ধ বা দুর্বলদের অপমান করা গুরুতর অপরাধ হলেও সম্মানহানি ও সংসার টিকিয়ে রাখার চাপে ভুক্তভোগীরা নীরব থাকেন। এই নীরবতা অপরাধীকে আরও উৎসাহিত করে। তাই পরিবার ও সমাজকে এ নীরবতা ভেঙে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সমাধানের মূল পথ ও করণীয়

নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে শুধু আইন সংশোধন বা আলোচনার আয়োজন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাস্তবমুখী ও বহুমুখী পদক্ষেপ:

১) কঠোর ও নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ: রাজনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘসূত্রতা বিচারব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস নষ্ট করে।

২) নৈতিক ও পারিবারিক শিক্ষা: পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও লিঙ্গসমতার শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেদের শেখাতে হবে যে শক্তি কখনো অন্যকে নিপীড়নের অধিকার দেয় না। মেয়েদেরও তাদের অধিকার, আত্মরক্ষা এবং হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

৩) ভিকটিম দোষারোপ বন্ধ করা: সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। ভুক্তভোগীর পোশাক, চলাফেরা বা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে অপরাধীর ওপর থেকে দায় সরানোর মানসিকতা বাদ দিতে হবে। অপরাধের সমস্ত দায় সম্পূর্ণভাবে অপরাধীর; তবে ভুক্তভোগী সহানুভূতি ও আইনি সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।

৪) গণমাধ্যম ও রাজনীতির দায়িত্ব: গণমাধ্যমকে ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রেখে দায়িত্বশীল পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি মেনে চলতে হবে এবং কোনো অপরাধীকে দলীয় আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

সম্মিলিত দায়িত্ব ও উপসংহার

একটি সভ্য সমাজের পরিচয় তার বড় বড় অট্টালিকা, প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে নয়; বরং তার সবচেয়ে দুর্বল ও অরক্ষিত নাগরিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার দেওয়ার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

নারী ও শিশুর সুরক্ষা কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এর জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাজ, নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত সচেতনতা প্রয়োজন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকা অপরাধকে সমর্থন করার নামান্তর। আজ যে ঘটনা অন্যের পরিবারে ঘটছে, তা আগামীকাল আমাদের নিজেদের ঘরেও ঘটতে পারে।

আমাদের এমন এক সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে নারীরা ঘরে ও বাইরে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং শিশুরা ভয়হীন পরিবেশে বড় হবে। কোনো মতপার্থক্যই সহিংসতাকে বৈধ করতে পারে না। নীরবতা ভেঙে সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মাধ্যমেই আমরা একটি বাসযোগ্য, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি। ৯

(০৯ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

মারীয়া মান্দা: ময়মনসিংহের কলসিন্দুর এলাকায় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেন মারীয়া। এই এলাকাটি একসময় ভালুকাপাড়া মিশনের আওতাধীনের থাকলেও বর্তমানে ধাইরপাড়া এলাকার অন্তর্গত। বর্তমানে মারীয়া মান্দা বাংলাদেশী নারী ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন। বাংলাদেশি নারীদের ফুটবলের মধ্যমাঠের খেলোয়াড় তিনি।

শিউলি আজিম: সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী দলের সদস্য শিউলি আজিমের জন্ম ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর গ্রামে। বাংলাদেশের মহিলা ফুটবল দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার, যিনি বসুন্ধরা কিংস মহিলা দলে এবং বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে রাইট-ব্যাক বা সেন্টার-ব্যাক হিসাবে খেলেন।

নাম্বিয়া লুইজি: নাম্বিয়া টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার শোলাকুড়ী ইউনিয়নের জয়নাগাছা গ্রামের মিন্টু দিব্রা ও সুকলা নকরেক দম্পতির ছোট মেয়ে। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং খেলাধুলার প্রতি গভীর ভালোবাসাকে পুঁজি করে তিনি আজ জাতীয় পর্যায়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

স্মৃতি কিস্কু: স্মৃতি কিস্কু হলেন 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' প্রতিযোগিতার একজন চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার ও স্ট্রাইকার, যিনি তার নিখোঁজ মায়ের ফিরে আসা এবং জীবনসংগ্রামের কারণে গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন। বাবার মৃত্যুর পর স্মৃতি ও তার পরিবার কঠিন আর্থিক সংকটে পরলেও স্বপ্নকে মরতে দেয়নি স্মৃতি।

এমনিভাবে শত সহস্র স্মৃতি কিস্কু, লুইজী নকরেকরা রয়েছে মুখিয়ে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ-সুবিধা পেলেই তারা হয়ে ওঠেবেন দেশের সম্পদ। তাই আদিবাসীরা বাংলাদেশের বোঝা নয়; তারা দেশের মূল্যবান সম্পদ। তাদের জ্ঞান, সংস্কৃতি, শ্রম, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তা শুধু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নয়, সমগ্র বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সমৃদ্ধির পথকে আরও সুদৃঢ় করবে। একটি বৈচিত্র্যময় সমাজই একটি শক্তিশালী সমাজ, আর সেই শক্তির অন্যতম ভিত্তি বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ৯

স্মৃতিতে অম্লান শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও

সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ

"স্মৃতিতে অম্লান - শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও"- বইটির লেখক ভিনসেন্ট রোজারিও (মাস্টার) শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের ছোট ভাই বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ফাদার আবেলের মৃত্যুর পর বইখানি লিখেন ও আমাকে এককপি বই আমার ছোট ভাই নির্মল যোসেফ গমেজের মাধ্যমে পাঠান। বইটি পেয়ে আমি খুবই খুশী ও আনন্দিত হয়েছি। ভিনসেন্টদাকে অনেক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

বইটির প্রচ্ছদ দেখে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম। ভুল দেখছি না তো? না, ভুল না ঠিকই, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর নিজের দু'হাত শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের ডান হাত ধরে চুম্বন করছেন। আমরা সাধারণত ছোটরা বড়দের ও সম্মানিতদের আশীর্বাদ গ্রহণ করি বা হাত চুম্বন করি। আর এ বইয়ের চিত্রে উল্টো দেখছি। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় যার হাত চুম্বন করে বলেছিলেন, "আমি আজ একজন জীবিত সাধু ব্যক্তির হাত চুম্বন করলাম।" আর সেই সাধু ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও (সময়কাল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ১ ডিসেম্বর) পোপ মহোদয় বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবলে হৃদয় মন যেন এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে। পোপ মহোদয় পুণ্যবানকে চিনেন ও স্বীকৃতি দেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, আধ্যাত্মিক, পবিত্র দায়িত্বশীল বাধ্য ও নম্র একজন যাজক।

সত্যিই শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল সবার অতি প্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছোটদের অনেক স্নেহ-আদর করতেন ও ভালোবাসতেন। পকেট থেকে চকলেট বের করে তাদের দিয়ে আনন্দ দিতেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, সহজ. সরল, দয়ালু, প্রেম-পূর্ণ ভালোবাসায় সিক্ত এক উদার ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রার্থনাশীল পবিত্র যাজক। তিনি সংযমী সাধু পুরুষের মতই সাদা-সিধা জীবন যাপন করেছেন। তাঁর এক মহৎ গুণ ছিল সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মত একজন আদর্শ পাপস্বীকার শ্রোতা। যেখানেই পাপস্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন একটি উপযুক্ত স্থানে তার পাপস্বীকার সম্পন্ন করতেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের বিষয়ে আরও অনেক বলা যায়।

বর্তমানে তিনি তুইতাল ধর্মপল্লীর কবর স্থানে শায়িত আছেন। তাঁর ছোট ভাই ভিনসেন্ট ফাদারের কবর খুব সুন্দর করে মার্বেল পাথর দ্বারা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিন তুইতালবাসী ও অন্যান্য ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। শোনা যায়, অনেকে ফাদারের কাছে প্রার্থনা করে আশ্চর্য ফল পাচ্ছেন। ঈশ্বরের অধিকতর গৌরব হোক, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ও প্রশংসা করি। প্রার্থনা করি

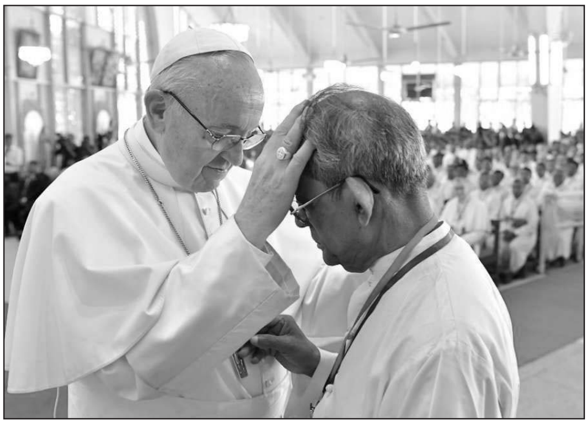

ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল যেন সাধু শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ছুটিতে আমি বাড়ী গিয়ে (তুইতাল) খ্রিস্টযাগে যোগদানের পর কবরে বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছি। ফাদার যেন সবাইকে আশীর্বাদ করেন ও ঈশ্বরের কৃপা অনুগ্রহ চেয়ে দেন।

ভিনসেন্ট রোজারিও'র বই "স্মৃতিতে অম্লান, শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও" পড়ে মনে হচ্ছে সবাই যেন সামনাসামনি বসে কথাবার্তা বলছেন। কে বলবে ফাদার নেই। বইটি সম্পর্কে আমার অনুভূতি হল - অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় চমৎকার এবং খুব সুন্দর একটি সুখপাঠ্য বই হয়েছে। অমোঘ সত্য একটি বই যেখানে ফুটে উঠেছে শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের সহজ সরল জীবন কাহিনী। বইটি লেখা হয়েছে পরিবারের আপন আত্মীয় স্বজন দ্বারা। লেখক ও আর ২/১ জন ছাড়া অন্য যারা লিখেছেন তারা হয়তো কোন দিন লিখেছেন হয়তো কোন দিনই লিখেননি; কিন্তু আজ প্রয়োজনেই তারা কলম ধরেছেন। আর এক এক জনের অন্তর থেকে, মুখ থেকে, মন থেকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তাই কাগজে সুসজ্জিতভাবে ফাদার আবেলকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কেমন, কত ভাল, গুণী, দয়ালু, উদার, মিষ্টভাষী, শান্তিপ্রিয়, নিরহংকার, সহজ-সরল। আমার মনে হয় ভাই, ভাই বৌ, বোন, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগ্নে, ভাগিনী, নাতি, নাতীন বা অন্য যারা লিখেছেন কোন কথাই বাড়ানো কথা নয়। তাই বলি- এ নহে লেখা বই, এটা সামনা সামনি বসে আলাপ আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মান অভিমান কথাবার্তা চালিয়ে গেছেন। আবার কখনো মজার মজার কথা বলে হাসি ঠাট্টার আনন্দোৎসব ইত্যাদি চলছে। কাজেই বইটি খুব চমৎকার। শ্রদ্ধেয় ফাদারের অনুরাগী যারা বইটি পেলে তারা খুব আগ্রহ নিয়েই পড়বেন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের জীবনে অনেক সত্য মজার ঘটনা, আবার কিছু দুঃখের ঘটনা আছে যা তাঁর জন্মের পর থেকেই বাড়ীর লোকদের কাছে শুনেছি এবং বইটিতে উল্লেখ করা আছে।

আমার ছোট বেলার একটি কথা বলছি। ফাদার আবেল সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হয়, যেহেতু মামার বাড়ীর মানুষ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমি খুব ছোট তখন তিনি বান্দুরা সেমিনারী গেছেন। আমার মামাতো ভাই অনীল মাস্টার (অনুদা) সাথে ছিল। সেমিনারীতে ছুটি পেলে বাড়ীতে আসতেন এবং আমাদের বাড়ী হয়ে নতুন তুইতাল যেতো। অনেকদিন দেখেছি এরূপ আসা যাওয়া করতে। আমরা ২ বোন একটু বড় হয়েছি। ডর ভয় দূর হয়েছে। অনুদা এসেই আমার মাকে বলত, পিশি আমরা আসছি। মা খুশী হয়ে বলতেন, ভাল করেছ হাত মুখ ধোয় এবং ভাত খেয়ে যাবে। এই ফাঁকে আমরা দু'বোন সুযোগ পেয়ে আবেলদাকে বলতাম, তালগাছ-তালগাছ খেলব। দাদা জানেন কি করতে হবে দু'হাত জোড় দিয়ে মাথায়

উপর শক্ত করে ধরে থাকছে আর আমরা দু'জনে দু'পাশের কাঁধে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ঝুলে পা গুটিয়ে থাকছি আর দাদা আমাদের দু'তিন পাক ঘুরিয়ে দিলেই আমরা হাসতে হাসতে খুব খুশী হতাম। মায়ের ডাক পড়লেই আমরা ছেড়ে দিতাম। হাত মুখ ধুয়ে খেতে যেতেম। সত্যিই তিনি ছোটদের ভালবাসতেন, সহজ সরল আনন্দদানকারী ছিলেন। আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল আমরা সব সময় মজা করতাম।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আবেল গোল্লা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত। আমি তখন তেজগাঁও বটমলী হোমের মেয়েদের দেখা শোনা, গান বাজনা, প্রার্থনা শিখানো, হোমের প্রয়োজন মত পড়ানো এসব কাজে ব্যস্ত। এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম ফাদার আবেল সাদা ধবধবে ক্যাসাক গায়ে দিয়ে এক ছাদের উপর বাইবেল পাঠ করছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আকাশের উপর থেকে এক উজ্জ্বল আলোর রশ্মি আরও উজ্জ্বল হয়ে ফাদার আবেলকে ঢেকে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম আর মনে মনে বললাম শ্রদ্ধেয় ফাদার দাদা কত পবিত্র, নির্মল সাধু মানুষ জীবিত অবস্থায় স্বর্গে যাচ্ছেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন আমার বাস্তব অবস্থা আরও খারাপ হল কখন কবে ফাদারকে পাব আর মজা করে বলব। কারণ দু'জনের বাসস্থানের দূরত্ব অনেক দূর। ফোনে এ সব বলে মজা পাব না। দয়ালু ঈশ্বর আমার মনের অবস্থা বুঝে অপেক্ষার অবসান ঘটালেন। এক শনিবার বিকেলে আমি তেজগাঁও মেরী হাউজের গেট দিয়ে বের হয়ে ফুটপাতে উঠেছি আর হঠাৎ দেখি ফাদার আবেল ক্যাসাক গায়ে ফার্মগেটের দিক থেকে হলিক্রসের মোড় পর্যন্ত আসছেন আর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। আমি ফাদারকে দ্রুত যিশুতে প্রণাম বলেই বললাম, দাদা একটু পাশে এসে দাঁড়াও; দরকারী কথা আছে। দাদা জিজ্ঞেস করে কি কথা? তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি এবং পুরো স্বপ্নটা বললাম। ফাদার আমার দু'হাত একত্র করে ধরে ঝাঁকা দিয়ে বলে, "দূর পাগলী, দুনিয়ায় আর কোন স্বপ্ন নাই" বলেই উনি শনিবারের মিশা দিতে গির্জায় চলে যাচ্ছেন আর আমি কোনভাবে আশীর্বাদ নিলাম। আমি নিজ মুখে বলতে পেরে খুব খুশী হয়েছি ঈশ্বরকে, ধন্যবাদ দিয়েছি আর আমার মনে শান্তি ও আনন্দ পেয়েছি।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল জীবিত থাকাকালে ক্যারিজমেটিক প্রার্থনা করতেন এবং অনেক মানুষ বিশ্বাসপূর্বক ফাদারের কাছে প্রার্থনা চেয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে সুস্থতা লাভ করেছেন এবং অনেকে মন্দ আত্মার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং এসব বাস্তব ঘটনা ফাদারের নামে যে বই লেখা হয়েছে (স্মৃতিতে অম্লান...) সেখানে এ সব বিষয়ে সত্য ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আমিও একজনকে মন্দ আত্মার হাত থেকে মুক্ত হতে দেখেছি।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দকে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস দয়ার জয়ন্তীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দান করেন এবং বাংলাদেশের কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় মণ্ডলী কর্তৃক তীর্থযাত্রীদের জমা কয়েকটি গির্জা অনুমোদিত করে তীর্থস্থান হিসাবে ঘোষণা দেন। সে সময় পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় কিছু সংখ্যক পুরোহিতকে রোমে আহ্বান করেন এবং বিভিন্ন প্রার্থনা সভা, অনুষ্ঠানাদি করার মধ্য দিয়ে পুরোহিতদের মানুষের জটিল, কুটিল, গোপন পাপ ও মন্দ আত্মা তাড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐ সময় শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল রোমে যান এবং পুণ্যপিতার দেওয়া এ ক্ষমতা লাভ করেন। কাজেই যারা পুণ্য বর্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজকদের কাছে মন খুলে পাপস্বীকার করেছেন তারা নিশ্চয় ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ ও অনেক কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

ভাওয়াল অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট তীর্থস্থানটি ছিল নাগরীর পানজোরা সাধু আন্তনীর চ্যাপেল। এ তীর্থ স্থানের দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও। তিনি তীর্থ যাত্রীদের আধ্যত্মিক উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন এবং এ পুণ্য বর্ষের অর্থ ব্যাখ্যা করতেন এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, উপদেশ দেওয়া ও পাপস্বীকার দানে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিদিন যত তীর্থযাত্রী আসছেন তাদের সাথে কথা বলা, সু-পরামর্শ দান করা, নানা সমস্যার সমাধান করা - এসব করে দিন কাটাতেন। প্রতিদিন তীর্থযাত্রীরা সাধু আন্তনীর চত্বরে আসতেন এবং প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন মিশনের বড় বড় দল আসতেন এবং তাদের সাথে মিশনের যাজকগণ আসতেন পাপস্বীকারে সাহায্য করা, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা ও কমুনিয়ন বিতরণ করা - এতে ফাদার আবেল অনেক খুশী হতেন।

ফাদার আবেলের সাথে মাহায্যকারী হিসাবে সিস্টার মেরী প্রভা এসএমআরএ এবং সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ সার্বক্ষণিক তীর্থস্থানে থাকছেন। সিস্টার প্রভা উপাসনায় খ্রিস্টযাগ প্রস্তুত করা, বেদীর সাজ সজ্জা প্রস্তুত করতেন। সিস্টার অমিয়া তীর্থযাত্রীদের আপ্যায়ন, তাদের দেখাশোনা, অপরিচিতদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থানগুলো দেখিয়ে দেওয়া, নিয়ম শৃংঙ্খলা বজায় রাখা- এ সব তদারকি করতেন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল আমাদের সাথে পানজোরা থাকতেন। গ্রটোর পাশে সুন্দর সুব্যবস্থা ছিল, ঘরটাও মনোমত হয়েছিল। খাবারের জন্য পাঁচ বেলা আমাদের সাথে কনভেন্টের খাবার ঘরে খেয়েছেন। আমরা সব সময় হাত ধরে ঘর থেকে খাবার ঘরে আনা নেওয়া করেছি। ফাদার কফি খুব পছন্দ করতেন, তাই আমাদের ঘরে ও ফাদারের ঘরে সব সময় কফি ও গরম জলের ব্যবস্থা ছিল। অনেক ভক্তগণ ফাদারের সাথে দেখা করতে আসতেন তখন কফি , ফল, বিস্কিট আনতেন। ফাদার সকলের সাথে অমায়িক আচার আচরণের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ দিতেন। খ্রিস্টান-অখ্রিস্টানান সবাই মুগ্ধ হতেন। এত কাজ করতেন, এত ব্যস্ত থাকতেন তথাপি ক্লান্তবোধ করতেন না। বেশীর ভাগ সময়ে মানুষ পাপস্বীকার করতেন। এতে তারা খুশী হতেন আনন্দ পেতেন আর শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন।

অবশেষে বলতে চাই "স্মৃতিতে অম্লান..." বইটির লেখা নিয়ে আমি আর আলোচনা করছি না বরং সকল শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহভাজন ক্ষুদে লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি। অনেকের সুন্দর সুন্দর কথার উদ্ধৃতি দিতে মন চায় তা সম্ভব নয়। কেবল ২/১ জনেরটা দিয়ে লেখার সমাপ্তির পথে আসি। ফাদার আবেলের বড় ভাইজির ঘরের নাতি ডমিনিক নিপু-নানুর অনুপ্রেরণায় যাজক হওয়ার ইচ্ছায় সেমিনারীতে আছেন, কিছুকাল পড়ে নভিশিয়েটে যাবেন। নানুর সম্পর্কে নিপুর ভাষ্য - "নানুর জীবন আর খোলা আকাশ একই রকম। বিশাল এক অস্তিত্ব যেখানে সবাই তাঁর দিকে আসতে পারে, তাঁর দিকে দেখতে পারে। তাঁর জীবন ছিল সুন্দর এবং লেখার ভাষা দিয়ে তা পরিপূর্ণভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ..."-।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেলের বোনের ছেলে আন্তনী অঞ্জন গমেজের ২/১টি উদ্ধৃতি দিয়ে সমাপ্তি টানি- "তাঁর চলে যাওয়া আমার কলমকে নির্বাক করে দিয়েছে, শব্দেরা সব যেন হারিয়ে গেছে। তবুও জানি তিনি আছেন আমাদের ভালবাসায়, আমাদের প্রর্থনায়, প্রতিটি ভাল কাজে আর এই অশ্রুসিক্ত স্মৃতির পাতায় ...।" আর আমি বলব আমার এ লেখার সময় সার্বক্ষণিক তিনি আমার সামনে হাসিমুখে জীবন্ত থেকে বলছেন, "তুমি এসব কি লিখ?" ৯

ধূসর শূন্যতা

সুনিল পেরেরা

ভূমিজ গরীব কৃষক কালু মিস্ত্রি। কীত্তনখোলা পেরিয়ে কোনাকুনি ডান দিকে হেঁটে গেলেই আমতলায় তার বাড়িটা। কালুর হারকেপ্পন বাবা ধনু মিস্ত্রি। এক'কালে তাদের বিস্তর খেতিগেরস্তি ছিল। লোকটার অনতি দীঘ শরীরের গঠন, পাকাপোক্ত চেহারা, লোহার মত শক্ত বুকের পাটা। গমগমে গলায় যখন হাক মারত, সে রাতে চোরেরা আর এদিকটায় আসার সাহস পেতো না। একখণ্ড কাঠের টুকরোর উপর মাথা রেখে জেগে ঘুমাবার ভান করত। কাসার কানা উঁচু করা থালার এক থালা ভাত শুধু লবণ আর কাঁচামরিচ দিয়েই খেয়ে ফেলত। গোলা ভরা ধান, ঘরভর্তি পাট। অথচ ফকির পেলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। এমনি কিপটে যে, ভাতের ফেন টুকুও ফেলতে দিত না।

এই ধনু মিস্ত্রি পাশের বাড়ির ঘোড়েল ছডি মাতব্বরের সাথে মামলায় জড়িয়ে সাত বছরে সর্বশান্ত হয়েছে। শেষে হালের গরু বিক্রি করে মামলা চালিয়েছে। উপরন্তু বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। সোনাদানা অল্প যা ছিল তাও ডাকাতরা নিয়ে একেবারে ফতুর করে দিয়েছে। শেষে বুড়ো বয়সে টাকার চিন্তায় বুড়ো মারা যায়।

পরিবারে তখন সতেরোটি চলমান পেট। ভায়েরা যার যার মত ভিন্ন হয়ে গেলে কালুর ভাগে পড়ে এক টুকরো জমি, একটি বড় আমগাছ আর এক চিলতে ভিটেয় একটি টিনের ঘর।

কালু কোন কালেই মিস্ত্রি পেশায় যুক্ত ছিল না। হয়তো কোন সময় বংশের কেউ কাঠ মিস্ত্রির কাজ করেছে তাই বাড়ির নামটি মিস্ত্রি বাড়ি হয়ে যায়। গ্রাম-গঞ্জে এ ধরনের নাম প্রায়ই দেখা যায়। যেমন জাহাজী বাড়ি, দর্জি বাড়ি, কুলু বাড়ি, চৌকিদার বাড়ি এমনি আরও কত নাম।

কালুর ছেলে ফালু ছোটবেলা থেকেই এজমার রোগী। টিনটিনে দেহটা নিয়ে পরের বাড়িতে কামলা খেটেছে। ছৈয়াল হিসেবে এলাকার তার নামডাক রয়েছে। সংসারে একটা পয়সাও দেয় না। পাইল পার্বণে বাপের জন্য একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি নিয়ে আসে। ছোট বোন চম্পার জন্য আনে কিছু প্রসাধনী।

একবার একজনের মাথা ফাটিয়ে দুই সপ্তাহ হাজত খেটেছে। জমি জমা নিয়ে বাপের সাথে কেবলই খিটিমিটি। গোপনে জমি মর্টগেজ রেখে বাজারের গেসু মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এখন গেসু ফসলের ভাগ চাচ্ছে। ফালু প্রতিবারই বাড়ি এসে একটা না একটা ভেজাল লাগিয়ে যায়। বাড়ি এলেই নেশা করে বাপকে গালাগাল করে। পেটে এক গেলাস পড়লেই নিজেকে এলাকার রাজা-বাদশা মনে করে। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে কলার চেপে ধরে বলে, তোর বাপের পয়সার নেশা করি?

অথচ নেশা করে রাতবিরাতে পথে ঘাটে পড়ে থাকে দেখে এলাকার চেয়ারম্যান থানায় চালান করবে বলে শাসিয়ে যায়। এখন সে নিজে চেয়ারম্যানকে শাসায় দু'ফোঁটা পেটে পড়লেই। একবার হাতে নাতে ধরা খেয়ে সাত-সাতবার মাফ চেয়ে, চব্বিশবার নাক খৎ দিয়ে মাটি চেটে এলাকা ছেড়েছিল। সেবার মাস ছয়েক আর বাড়ি আসেনি।

অসুস্থ বাপের সংসারে কোন আয়-উৎপন্নি নেই। পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না। অন্যদিকে নিজে তো সংসার করেনি, বোনটারও বয়স কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়েছে। বিয়ের কয়েকটা প্রস্তাবও এসছে। কিন্তু চম্পা ফিরিয়ে দিয়েছে। যতদিন বাপ বেঁচে আছে তাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। হায়রে জীবন! কবে বিধাতা দয়া করে তার বুড়ো বাপটাকে তুলে নেবেন, তখনই মেয়ের বিয়ে হবে।

বাড়ন্ত যুবতি মেয়ে চম্পা গায়ের রঙ তেমন ফর্সা নয় বটে, তবে দেহে আলগা চটক রয়েছে। কৈশোরের লাবন্যমাখা চোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ আভা এখনো স্পষ্ট প্রতীয়মান। ঝলমলে হাসি মাখা মুখে কথা বলে।

কদিন আগে কালু বাড়িতে এসেই উৎপাত শুরু করে দিল। দুইজন স্যাঙ্গত দুই বাহুতে ধরে রেখেছে। কালু নেশায় দাঁড়াতেই পারছেনা। বস্তির নোংরা ভাষায় বাপকে গালমন্দ করছে।

চম্পা বারান্দায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক ঘরের দরজা বরাবর। তার মনে ভয়, দাদা এবার বাপকে মারতে আসবে। ছেলে দুটি চম্পার দিকে তাকিয়ে পিট পিট করে হাসছে।

বাড়ির পাশে যে বড় আম গাছটা রয়েছে সেটা করাত কলের জলু বেপারীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। বেপারী কামলা নিয়ে গাছ কাটতে এসেছিল। বাপ-বেটি মিলে গাছ কাটতে দেয়নি। সে কারণেই বাপের উপর রাগ। টাকা যা গিয়েছে তার অনেকটাই পেটে ঢুকেছে। বাকিটা আজকেই হজম হয়ে যাবে। জলু বেপারী রাগে বাপ-বেটিকে শাসিয়ে গেছে। চম্পাও ভয় পায়নি, চড়া গলায় প্রতিবাদ করেছে।

কালু বিছানায় শুয়ে অসহায়ের মত ছেলের গালাগাল হজম করেছে। হাতের কাছে ধারালো দা'টা চেপে ধরে রাগে অপমানে ফুঁশতে থাকে। দু'চোখে কেবলই আশাহীনশূন্যতা ধূ ধূ করছে।

এসব নানা দুঃশ্চিন্তায় কালুর শরীরটা আরও ভেঙ্গে পড়েছে। এখন দেখলে মনে হয় একটা হারের খাঁচা। তেজালো শীতে ঠাণ্ডা পড়লেই কাশিটা বেড়ে যায়। সে তামাক-বিড়ি খাওয়া তো পাঁচ-সাত বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছে। তারপরও কাশিটা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, তার দেহটাকে শেষ না করে ছাড়বে না। চাপা খসখসে গলায় কথা বলতে গেলেই কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে ওঠে। আজকাল কবরেজি পাঁচনেও কাজ হচ্ছে না। দেহটা এত দুর্বল হয়েছে যে, এখন আর দূর্বল হবার কিছু নেই। মনে হচ্ছে বাড়িতে যমদূতের আনাগোনা অচিরেই শুরু হবে।

সকাল হলেই উঠানে রোদে বসিয়ে দেয় চম্পা পাটের ছালার উপর শুয়ে বসে খকখক করে ক্রমাগত কাশে আর দলাদলা কফ ফেলে। কফের দলায় মাছিরা ভনভন করে। এসব দেখে চম্পা রেগে গিয়ে বলে - বাবা, তোমারে না কইছি, দুয়ারে মাডিতে কফ ফালাইবা না। যেখানে সেখানে কফ ফালাইলে মাছি বসে, রোগ জীবানো ছড়ায়।

কফের দলার উপর ছাই ফেলতে ফেলতে বাবার সামনে ভাঙ্গা টিনের বাটিটা ঠেলে দেয় চম্পা।

বাপের সেবা যত্ন করে চম্পাই। মা মরেছে সাত আট বছর আগে। গোয়াল ঘরের পেছনে মাটির দেয়ালটা লেপতে গিয়ে একটা গর্তে হাত পড়তেই বিষাক্ত সাপের ছোবল। নানা জনের নানান পরামর্শ করতে করতেই বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তার বললেন, রোগির মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। সময় মত আনা হলে হয়তো বাঁচানো যেতো। স্ত্রীর কথা মনে হলে কালু এখন চোখে তাকিয়ে সজল পরিপুষ্ট পৃথিবীটা দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে টালুমালু করে তাকিয়ে থাকে শুধু। তার অকাট মাথায় তখন আর কিছুই ভাবতে পারে না।

বাড়ির উত্তরে মরা খালে সারা বছর পানি জমে থাকে। পাটপঁচা সে পানিতে মশার বসবাস। খালের ওপারে কানি বিলে নতুন রোয়া ধানখেতে লক্ষ্মী ঢেউ খেলছে বাতাসে। খালের পাড়ে আগাছা আর চোরকাঁটায় ভরা একটা ঝোঁপ। ঝোপে প্রায় বিশ হাত লম্বা সাইজের অনেকগুলি বেত গাছ জড়িয়ে রয়েছে। নিদানকালের সম্বল তাই কালু এখানে হাত দেয় নি। চৈত সংক্রান্তির মেলায়

বেঁচতে পারলে বেশ দাম পাওয়া যাবে।

এক দুপুরে হঠাৎ করেই জলু করাতির ছেলেকে খাল পাড়ে দেখা গেল ঘুরঘুর করছে। চোয়াড়ে মার্কা ছেলেটার থলথলে গায়ে বগল কাটা গেঞ্জি। পটুয়াদের আঁকা ছবির মত গোল গাল চেহারা। মেয়েদের দেখলেই ফিচিক করে হাসে। একবার মববাজি করতে গিয়ে কান কেটেছে। সেই থেকে ওর নাম হয়েছে কানকাটা বদি। দাদা ফলুর সাথে একদিন এ বাড়িতেও এসেছিল। পথে চম্পাকে দেখলেই রসালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

বদি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকে এক পর্যায়ে দমাদম বেত কাটতে থাকে। শব্দ পেয়ে কালু কাঁপানো গলায় হুংকার দেয় - কেডা - কেডা বেত কাডে? এই বেত আমার।

খালের ওপাশে শব্দ নেই। কাটছে তো কাটছেই। এবার চম্পা রেগে খাল পাড় যায়। ঝাঝালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করে। বদি তেমনি নির্বিকার। বেত কাটা শেষ হলে ঘাড় হেলিয়ে একবার চম্পার রাগান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। তারপর প্রায় পনেরো-ষোলটা বেত কুণ্ডুলি পাকিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। চম্পার ভরাট যুবতি দেহটার প্রতি বদির অনেক দিনের নজর।

এর কিছুদিন পর। মরা কার্তিকে শীতের আগেই বেশ ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দিন শেষে হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নেমে যায় দিনের আলো তাড়িয়ে দিয়ে। বাবার ঘরে বাতিটা রেখে চম্পা উঠানে নামে। সবে মাত্র অমাবস্যা গিয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। উঠানের কাজ এখনো শেষ হয় নি। ঠিক এ সময় একটা পুরুষ পশু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ ধস্তধস্তি হয় কিছুক্ষণ। পশুটা তার মুখ চেপে ধরে রেখেছে বুকের উপর বসে। চম্পা একবার ক্ষীণ কণ্ঠে ‘বাবাগো’ বলে চিৎকার করেছিল বটে। কিন্তু কালুর ক্রমাগত কাশির ফলে সে চিৎকার তার কানে পৌছায় নি।

অনেকক্ষণ চম্পার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে কালু দুই তিনবার মেয়েকে ডাকে। শেষে ভাঙ্গা দেহটা টেনে নিয়ে উঠানে পা দিতেই তার পায়ে ঠেকে একটা নারী দেহ। ‘চম্পারে’ বলে চিৎকার দিতেই বুত চাপা দেওয়া কাশি। কাশতে কাশতে বুক ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এসময় চম্পার চৈতন্য ফিরে আসে। নিকশ কালো অন্ধকারে দুজনেই বাকহীন - অশ্রুহীন হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশে ততক্ষণে তৃতীয়ার মরা চাঁদ উঠেছে।

কথাটা ফালুর কানে যায়। ইদানিং মাঝে মাঝেই কি কারণে যেন এলাকায় আসে। মন চাইলে বাড়িও আসে। কারও সাথে তেমন আলাপও হয় না।

এক রাতে বদি আর তার বাবা সবে মাত্র কারখানা বন্ধ করেছে। অমনি ফালু আসে। আসেপাশে তেমন কেউ ছিল না। বাপের সামনেই হেঁসোর এক কোপে বদির গর্দানটা নামিয়ে দেয়।

সেই যে পালিয়েছে এরপর আরও এলাকায় কোন দিন ফালুকে কেউ দেখেনি। চম্পাকে নিয়ে পুলিশ বেশ ঘাটাঘাটি করেছে কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি। এরপর থেকে চম্পার চোখে কেবলই ধূসর শূন্যতা।

এখন সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্রই চলছে এমনি নিষ্ঠুরতা আর অনাচার। পাশবিকতার কাছে পরাজিত হচ্ছে মানবতা। দুর্জনের কাছে সুজন, মিথ্যার কাছে সত্যের পরাজয়। নোংরামি আর প্রতারণা এখন নতুন সব সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। জোর-জবরদস্তি আর দখল হচ্ছে নানান দোহাই তুলে। ধর্ম এখন ক্ষমতা, বাণিজ্যের হাতিয়ার। সুকৌশলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার বিষ ঢালা হচ্ছে। নিষ্ঠুরতার সীমা নেই, বর্বরতার শেষ নেই। হিংসার প্রেমহীন পৃথিবীতে এখন অসুস্থ নিন্দুকেরা আর সুচতুর চাটুকারের দল সদম্ভে রাজত্ব করছে সর্বত্রই। ন্যায়, ন্যায্যতার পক্ষে কথা বলার সাহসী মানুষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। নেতারা শুধু ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই ব্যস্ত। আশাহীন মানুষের সামনে কেবলই নিরাশার দৃশ্যপট। নেতাদের শুধু মঞ্চ কাঁপানো ভূয়া বক্তৃতা। এভাবেই ন্যায্যতা আর মানবতা হারিয়ে যাচ্ছে নরকের অতল অন্ধকারে। ৯

ভেন্ডর তালিকা ভুক্তকরণের বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর **Contractor/Printings/ ICT ITEMS/General Suppliers/Service Providers** হিসাবে ভেন্ডর তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে আগামী ০৯/০৮/২০২৬ হতে ২৪/০৮/২০২৬ তারিখের এর মধ্যে প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ ২৫/০৮/২০২৬ তারিখের মধ্যে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

২৬ নং পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

হট লাইন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০ - এক্সটেনশন-১৪৮১, ১৪৮২

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন

https://www.cccul.com/attachments/1785763535.pdf

বিজ্ঞ/১৫৮/২৬

আলোচিত সংবাদ

পাইপলাইনে মিয়ানমারের গ্যাস, সম্ভাবনা কতটা

দেশে চলমান গ্যাস-সংকট মোকাবিলায় গ্যাসের নতুন উৎস খুঁজছে সরকার। মালয়েশিয়া থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আনার উদ্যোগের পর এবার মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানির বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশ পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি গ্যাস আনার প্রস্তাব দিয়েছে। বিকল্প হিসেবে মিয়ানমার এলএনজি সরবরাহের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনার আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে প্রস্তাবটি এখনো প্রাথমিক আলোচনার পর্যায়ে। কত গ্যাস পাওয়া যেতে পারে, কোন গ্যাসক্ষেত্র থেকে তা আসবে, পাইপলাইন কোন পথে নির্মিত হবে, এর ব্যয় ও নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে–এসব বিষয় এখনো স্পষ্ট নয়। তবে মিয়ানমারে গ্যাসের মজুত থাকলেও দেশটির উৎপাদন কমছে। এছাড়া রাখাইনের সংঘাত, সীমান্ত এলাকায় আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণ এবং দুই দেশের মধ্যে রোহিঙ্গা সংকটের জন্য কূটনৈতিক টানাপোড়েন তো আছেই। জ্বালানি খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব কারণে মিয়ানমারের গ্যাস বাংলাদেশের চলমান সংকটের তাৎক্ষণিক সমাধান হওয়ার সুযোগ নেই। তবে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি বদলালে এটি দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/tqwjl4l6cd

পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে ডিএসসিসির ৩২৭ কোটি টাকার মেগা কর্মসূচি

রাজধানীকে একটি পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শুধু পরিচ্ছন্নতা খাতেই ৩২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের মূল বরাদ্দের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি। ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন, সরকারের 'ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি' বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নগর পরিচ্ছন্নতার পুরো ব্যবস্থাপনাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে শিফটভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সড়কে কতজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী দায়িত্ব পালন করবেন, তারও সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের তদারকির জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে পৃথক 'মনিটরিং টিম' গঠন করা হয়েছে, যেন মাঠপর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। তিনি আরো জানান, বিডি ক্লিন ও সাজেদা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যত্রতত্র ময়লা না ফেলে নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে ধারাবাহিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে মতিঝিল এলাকায় সিটি ইন্সপেক্টর নিয়োগ দিয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সরাসরি তদারকি করা হচ্ছে।

https://www.protidinersangbad.com/national/580012

চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর ভয়াবহ রূপ

চট্টগ্রামে চলতি বছরের মধ্যে ডেঙ্গুর সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে গত জুলাই মাসে। বছরের সাত মাসে জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩৪ জন। এর মধ্যে শুধু জুলাই মাসেই আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩৬ জন, যা মোট আক্রান্তের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। একই সঙ্গে চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া তিন জনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসেই। জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বছরের শুরু থেকে জুন মাস পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকলেও বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর জুলাই মাসে হঠাৎ করেই সংক্রমণ বেড়ে যায়। এক মাসেই সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র: সুপ্রভাত

অভিবাসী ঠেকাতে ১৬০০ ফুট দীর্ঘ ভাসমান প্রতিবন্ধক বসাচ্ছে স্পেন

দুই দিন আগে স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত শহর সেউতায় হাজার হাজার অভিবাসীর আকস্মিক ঢল নামে। এ ঘটনার পর দেশটির সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়ে ইউরোপজুড়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মরক্কো ও সেউতার মধ্যবর্তী স্থানে সাগরে ভাসমান প্রতিবন্ধল (ফ্লোটিং ব্যারিয়ার) স্থাপন করা হচ্ছে বলে শনিবার (১ আগস্ট) জানিয়েছে স্পেনের কর্তৃপক্ষ। উত্তর আফ্রিকায় স্পেনের ছিটমহল হিসেবে পরিচিত সেউতা থেকে অধিকাংশ অভিবাসীকে মরক্কোয় ফেরত পাঠানোর পর স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দেন। তবে যাঁরা এখনো সেউতায় রয়ে গেছেন এবং পুলিশ ও স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতার চোখ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। নতুন কাঠামোটি প্রায় ১ হাজার ৬০০ ফুট দীর্ঘ এবং স্ফীত করা যায় এমন একটি ভাসমান প্রতিবন্ধক। এটি পানির নিচে সর্বোচ্চ এক মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এর বাইরে স্পেনের নৌবাহিনী নোঙর করা বয়ার আরেকটি সারি বসিয়ে এ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করবে।

https://www.prothomalo.com/world/europe/xkqx8s73zl

অস্ট্রেলিয়ায় নির্মিত হচ্ছে না বহুল আলোচিত 'ট্রাম্প টাওয়ার'

আলটাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড ইয়াং এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছেন, ইরান যুদ্ধ এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে অস্ট্রেলিয়ায় এই ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে টাওয়ার নির্মাণের কাজ অব্যাহত থাকবে এবং সেখানে ট্রাম্পের নামের পরিবর্তে অন্য কোনো নাম ব্যবহার করা হবে।

গত ফেব্রুয়ারিতে আলটাস প্রপার্টি গ্রুপ ৯১ তলা বিশিষ্ট এই বিলাসবহুল ভবন নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিল, যা হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম ভবন। ট্রাম্পের দুই ছেলে ডোনাল্ড জুনিয়র এবং এরিক ট্রাম্প এই প্রকল্পের তদারকি করছিলেন। তবে ঘোষণার পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ও বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে এই উদ্যোগ। বিশেষ করে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি ও সামাজিক বিভাজনের প্রতিবাদে ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ এই প্রকল্প বন্ধের দাবিতে একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেন। পিটিশনটি শুরু করেছিলেন 'সিকে' ছদ্মনামের এক নারী, যিনি ট্রাম্প সমর্থকদের রোষানল থেকে বাঁচতে নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাংবাদিকদের জানান, যুক্তরাষ্ট্রে চলমান সহিংসতা ও অস্থিরতার দৃশ্য দেখে তিনি এর প্রতিবাদ স্বরূপ এই পিটিশন চালু করেন। *সূত্র: সিএনএন*

https://www.ittefaq.com.bd/788679/

আস্থা নেই উয়েফার, বিপাকে ইনফান্তিনো

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর ওপর থেকে নিজেদের আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা। বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব পরিচালনার নতুন একটি ইউনিট থেকে শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ফিফা বাতিল করায় শনিবার (১ আগস্ট) এক কঠোর বিবৃতিতে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সংস্থাটি। এর আগে ইনফান্তিনোর পরিকল্পনা ছিল, নতুন ওই ইউনিটের প্রায় ২০ শতাংশ অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে প্রায় ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার তোলা হবে। তবে উয়েফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর অভিযোগ ছিল, তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই এমন বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চারপাশ থেকে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই বিতর্কিত পরিকল্পনা থেকে সরে আসে ফিফা। উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনা বাতিল হওয়া মানে পুরো ফুটবলের জন্য একটি বড় জয়। তবে ফিফার বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ফেরানোর কাজ যে সহজ হবে না, সেটিও স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা।

https://bangla.plus/bijoy-unicode-converter/

ফেল করলেই জীবন পরীক্ষায় সব ফেল হয় না

আলেক রোজারিও

প্রিয় স্নেহ সিক্তভাজন আদরের নাতি-নাতনিগণ,

চিঠির মধ্য দিয়ে আমার আদরের মমতার স্নেহশীষ আশীর্বাদ নিবে। আমি ঈশ্বর ভগবানে ভক্ত নতজানু হয়ে বিশ্বাস ও আশা করি; তোমরা নিজ নিজ পিতামাতার আদরের স্নেহভাজন হয়ে তাঁদের আশ্রয় স্থলে ভাল আছ। মা বাবার লালন-পালনের যত্নে লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে জীবন গড়ছো এমন শুভ কামনায়। পরসমাচার আমি তত ভাল নই। ফ্রান্স'সহ সারা ইউরোপে গ্রীষ্মকাল শুরু হতেই ইউরোপে তাপদাহ চলছে। সে তাপদাহ হতে দৈত্য দাবানল প্রবাহ হতে ভয়াবহ রূপ নিয়ে ইউরোপের অনেক দেশ অগ্নিপ্রবাহে জ্বলছে। কেবল সারা ফ্রান্স জুড়েই ৫২টি স্থানে দৈত্য দাবানলের আগুন জ্বলছে দিনরাত ধরে। দমকলবাহিনী সহ নানা বাহিনী দিনরাত একাধারের কাজ করেও জ্বলন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ। ফলে হাজার হাজার হেক্টর জমি, বাগান বাড়ি, ফসলি জমি ও বনজঙ্গল পুড়ে আজ ছাই। অপরদিকে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত যানচলাচল বন্ধ দিয়ে। বলতে গেলে স্থল যান চলাচল অধিকাংশেই বন্ধ। দুরাগ্রস্থের চিন্তা ভয়ের উপর বিশ্বে চলমান নানা যুদ্ধের অকুতো তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধেরভয়ের চাপ। আবার মরার উপর খাড়া ঘা নাতি নাতনি'দের প্রথম সাময়িক, মূল্যায়ন, অর্ধ বার্ষিকী, মডেল টেস্ট ও প্রস্তুতি পরীক্ষার খারাপ রেজাল্ট। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর; প্রতি ক্লাশেই কয়েকজন বাদে অনেকেই কম বেশি লাল নম্বর পেয়ে মা বাবাসহ রেজাল্টে দিশেহারা।

জীবনে একটা পরীক্ষা খারাপ করলেই জীবনের সব পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায় না; বা সব শেষ হয়ে যায় না প্রিয় নাতি-নাতনি'রা। একবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেই সব পরীক্ষার ফল ব্যর্থ হবে এমন কোন যুক্তি নাই। একবার না পারলে দেখ শতবার। তবে ব্যর্থ ফল হতে শিক্ষা নিয়ে ব্যর্থতা ঢাকতে হয়। "লেখাপড়ার পদ্ধতিটা কষ্টকর হলে ও এর ফল অত্যন্ত বেশি মধুর হয়"-এরিস্টটল। তবে সমাজের মানুষ লেখাপড়ার কষ্টটা দেখে না বরং দেখে ভাল রেজাল্ট। তখন বাবার নাম কর্ম পদবী বদল করে সবায় বলে, দেখ জিপিএ ফাইভ পাওয়া ছেলের বাপ যাচ্ছে ছেলে-মেয়ে নিয়ে। বারবার চেষ্টা ও পরিশ্রম করে সুন্দর মধুর সুনামের ফল ধরতে হয় ছাত্র/ছাত্রীদের। আমরা যেমন নিজ পায়ের উপর দাঁড়ায়ে পায়ের গৌরব করি তেমনি লেখাপড়ায় ভাল করে মাথা উচুঁ করে গর্ব করতে পারি। পা ছাড়া যেমন কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি লেখাপড়া শিক্ষা ছাড়াও কেউ সম্মানের সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সুপ্রিয় নাতি-নাতনিগণ; ডিজিটাল জগতে ভালো লেখাপড়া ছাড়া সুন্দর আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না। তাই লেখাপড়া তোমাদের যত্নসহ একান্ত দরকার ছোটকাল থেকেই। ভালভাবে দাঁড়িয়ে বাঁচার জন্য লেখাপড়ার বিকল্প নাই। লেখাপড়াই প্রজন্মকে সুউচ্চে নিয়ে যায় মর্যাদা দিয়ে।

ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, সচিব, অফিসারদের যে সুনামে মানুষ ডাকে সে সুনামে দিনমজুর, কৃষক, মুচি, গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের ডাকে না। ঈশ্বর সকল ছাত্রছাত্রীদেরই ৩৩ নম্বর পেয়ে পাস করার ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন জন্ম থেকেই। ঈশ্বর প্রজ্ঞাকে যে চেষ্টা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে কাজে লাগায় সে ফল পায় হাজার গুণ; জিপিএ ফাইভ আর যে খাটায় না সে ফল পায় না। "যা পাবে না তার জন্য হাত বাড়াবে না।" উদাহরণ: চাঁদ সূর্য আকাশ ধরতে পারবে না তার দিকে হাত বাড়াবে না। বরং কত নম্বর পেয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাস করতে পার তার দিকে শ্রম মেধা পরিশ্রম দিয়ে হাত বাড়াও। তোমরা ফেল করেছ তার চিন্তা হিসাব করো না বরং পরের পরীক্ষায় পাসের চিন্তা চেতনা নতুন পদক্ষেপের দিকে হিসাব করে কাজ কর। বরং আগের পড়াশুনার মডেল বদল করে লেখাপড়ার মডেল ধরে অগ্রসর হও দয়া করে। লেখাপড়া করে জ্ঞানী হও। "মূর্খতা ডিজিটাল জগতের জন্য বড় পাপ, আবার যারা লেখাপড়া করে না তারাই বড় মূর্খ।" প্রিয় সোহাগ আশীর্বাদে পুষ্ট নাতি-নাতনিদ্বয় গণ বড় হলেই বড় হয় না বরং জীবনে বড় দায়িত্বটা নিয়ে বড় লেখাপড়া করলেই বড় হয়। বড় লেখাপড়া করে বড় হয়ে বড় মানব সেবা করে জীবনে বড় হও এ একান্ত আশীর্বাদ করি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য। "ধনে এবং মানে বড় হলেই মানুষ অন্তরের দিক দিয়ে বড় হয় না"--স্মিথ। তোমাদের শিক্ষা নিয়ে মানবাত্মায় মানব সেবায় বড় হতে হবে। মানব সেবা বড় ধর্ম। উঁচুমানের শিক্ষিতরাই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই আমার আর তোমাদের ভিতর থেকেই হয়েছে। চলো, পাশের জ্ঞানীদের অনুসরণ করি ও জীবনে সফলকাম হই।

বিফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের আশাহীন বা অকেজো করে না। জীবনে যারা জয়ী হয়েছে সফলতা বা ভাল ফল করেছে তারা কিন্তু ফেল বা বিফলতার উপর ভর বা ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত করে। তোমরা ও জীবনের ফেল থেকে অভিজ্ঞতা-তিক্ততা-ব্যর্থতা-ঘৃণাত্ম নিয়ে সফলতার সৌভাগ্য রচনা কর। ঈশ্বর পাস ফেলের উভয় পক্ষেই আছে। তোমাদের নিত্য লেখাপড়ার ভিতর ভুল গুলো খোঁজে নিয়ে আবার নতুন চিন্তা চেতনা চেষ্টা পরিশ্রম করে ভাল পাস কর। লেখাপড়ার খারাপে তোমরা অধৈর্য, উত্তেজিত ও রাগান্বিত হবে না। ধৈর্য ধরে আবার চেষ্টা অব্যাহত রাখ। ধৈর্য, চেষ্টা ও পরিশ্রমে স্বয়ং ঈশ্বর থাকেন পাশে। "যেখানে চেষ্টা, পরিশ্রম ও ধৈর্য নাই সেখানে সাফল্যও নেই"--ইউলিয়াম। "যে পদ্ধতি অনুযায়ী ধারাবাহিক পরিশ্রম করে তাকে খোদার পুরস্কার হতে বাদ রাখে না।" প্রতিটি পরিশ্রমের, কষ্টের ও চেষ্টার মূল্য আছে। বিনা কষ্টে, চেষ্টা, ধৈর্যে ও পরিশ্রমে কোনকিছু অর্জন হয় না। পাখীরা যেমন ভোর হতেই পরিশ্রম ও চেষ্টা দিয়ে নানা স্থানে উড়ে গিয়ে গিয়ে খাদ্য যোগাড় করে তেমনিই নাতি ও নাতনি'রা চেষ্টা, পরিশ্রম ও স্রষ্টার নামে ধৈর্য দিয়ে ভাল লেখাপড়া করতে হবে তোমাদের। পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েই ভাগ্যকে অলৌকিক ভাবে পরিবর্তন করা যায়। "অতিরিক্ত পরিশ্রমই জীবনে প্রতিষ্ঠা আনে।" ভাল লেখাপড়াই স্বর্গসম সুখ দিতে পারে ডিজিটেল জগতে। চেষ্টা ও যথার্থ পরিশ্রম করলেই আশা ও ইচ্ছা অনুযায়ী পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা যায়। কোন চেষ্টা ও পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। সুন্দর দিন সবার জন্য অপেক্ষা করে, তা চেষ্টা পরিশ্রম দিয়ে ডেকে আনতে হয়। যার চেষ্টা, পরিশ্রম ও চেতনা যত সজাগ তার রেজাল্ট তত ভাল হয়।

ব্রিটিশ একটি প্রবাদ আছে, "একটি শান্ত সমুদ্র কখনো দক্ষ নাবিক তৈরি করতে পারে না।" তেমনিই নাতি-নাতনিগণ ও প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা ও চেষ্টা পরিশ্রম ছাড়া দক্ষ গৌরবময় ছাত্রছাত্রী হতে পারবে না। জীবনের খারাপ ফলাফলের কঠিন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা দিয়েই শিক্ষার্থীরা নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। অভিজ্ঞতা, চেষ্টা ও পরিশ্রম হল সবচেয়ে বড় ভাল স্কুল শিক্ষক। শিক্ষকরাই শিক্ষাদান করেন। চেষ্টা পরিশ্রম দ্বারা লব্ধজ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। পরীক্ষার খারাপ ফলাফলের পরে আবার চেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আবার চেষ্টা ও পরিশ্রম দায়িত্ব কাজকে উৎসাহি করে। সবার শুভ কামনায়।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের লেখক কর্মশালা ও যোগাযোগ দিবস পালন

নিউটন মণ্ডল: খ্রিস্টান সমাজে দক্ষ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল লেখক গড়ে তোলা এবং সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার বার্তা মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে 'লেখক কর্মশালা ও বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন'। ৩০ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার বিকালে রাজধানীর কাকরাইলে আর্চবিশপস হাউজ হল রুমে দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এবারের কর্মশালার প্রতিপাদ্য– 'খ্রিস্টীয় সমাজে দক্ষ ও সৃজনশীল লেখক গড়ে তোলা ও যোগাযোগ দিবসের বাণী সহভাগিতা'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রদেশপাল বিশপ বিজয় এন. ডি ক্রুজ ওএমআই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি, রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ, বিশপস হাউজের রেক্টর ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও। এছাড়া ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরুসহ কমিশনের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মোট ৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন।

কমিশন সেক্রেটারি ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মনের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রার্থনা পরিচালনা করেন ফাদার শিশির কোড়াইয়া। পরে আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, কমিশনের সমন্বয়কারী, মনোনীত কমিশন সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু বলেন, বর্তমান সময়ে যোগাযোগের মাধ্যম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন সংবাদ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তাই খ্রিস্টান সমাজের জন্য এমন লেখক ও যোগাযোগকর্মী প্রয়োজন, যারা সত্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল, সৃজনশীল এবং মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এমনভাবে খ্রিস্টের বাণী তুলে ধরতে সক্ষম। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়ভাবে শেখা ও নিজেদের লেখনীকে আরও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি ক্রুজ ওএমআই বলেন, লেখনী শুধু তথ্য প্রকাশের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তা ও হৃদয়কে প্রভাবিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। একজন খ্রিস্টান লেখকের লেখায় সত্য, ভালোবাসা, আশা, ন্যায়বোধ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অসত্যের বিস্তারের মধ্যে খ্রিস্টীয় লেখকদের সত্য ও নৈতিকতার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিয়মিত পড়াশোনা, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের লেখনীকে উন্নত করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি বলেন, একজন ভালো লেখক হওয়ার জন্য শুধু ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, বিষয়কে উপলব্ধি করার দক্ষতা এবং মানুষের জীবন ও বাস্তবতাকে কাছ থেকে দেখার মানসিকতা। তিনি তরুণ লেখকদের নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা ও প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে আধুনিক যোগাযোগের ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য সৃজনশীলতার চর্চারও আহ্বান জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে 'লেখালেখি এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাবনা' শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সংবাদ ও ফিচার লিখন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উকানিউজের নির্বাহী সম্পাদক মি. রক রোনাল্ড রোজারিও। অধিবেশনে সংবাদ ও ফিচারের পার্থক্য, সংবাদ লেখার কাঠামো, তথ্য সংগ্রহ, শিরোনাম নির্বাচন, প্রতিবেদনের ভাষা, সংবাদমূল্য এবং পাঠকের উপযোগী করে লেখা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। রাতে অংশগ্রহণকারীরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজ করেন।

দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শুরু হয় সকালের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। এরপর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় দিনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন যথাক্রমে 'কবিতা ও এর লিখন কৌশল' এবং 'মনের সুখে গল্প লিখি: প্রসঙ্গ ছোট গল্প'। অধিবেশনগুলো পরিচালনা করেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক মি. তপন বাগচী। কবিতা লেখার মৌলিক কৌশল, ভাবনা ও ভাষার ব্যবহার, শব্দচয়ন এবং কবিতাকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং ছোট গল্পের কাঠামো, চরিত্র নির্মাণ, কাহিনির গতি, সংলাপ এবং গল্পের সমাপ্তি সম্পর্কে ধারণা দেন।

দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় অধিবেশন- 'অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেখালেখি'। এ অধিবেশনে অংশ নেন এসএ টিভির নির্বাহী সম্পাদক মি. প্যাট্রিক ডি'কস্তা, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, মি. রবার্ট বিপুল রায় এবং নিউটন মণ্ডল।

মি. ডি'কস্তা অংশগ্রহণকারীদের শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মূলধারার সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমে নিজেদের লেখার দক্ষতা তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষদিকে নিউটন মণ্ডল লেখকদের লেখালেখির ক্ষেত্র ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তুলে ধরেন-একজন লেখক শুধু একটি সংবাদপত্র বা একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য লেখেন না; বরং বর্তমানে লেখার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। তিনি মণ্ডলী পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যম এবং ব্যক্তিগত সংবাদমাধ্যমে লেখালেখির সুযোগ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সদস্য ফাদার শিশির কোড়াইয়া। পরে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সদস্যদের সহযোগিতায় কেক কাটা হয়। এর মধ্য দিয়ে দুইদিনব্যাপী কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে উপাসনা ও পুণ্য সঙ্গীত বিষয়ক সেমিনার

ফাদার রোদন হাদিমা: গত ২২-২৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ বিশপ হাউজের পালকীয় কেন্দ্রে চারদিনব্যাপী উপাসনা ও পুণ্য সঙ্গীত বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রার্থনা ও উপাসনা বিষয়ক কমিশনের উদ্যেগে এবং নিজস্ব স্থানীয় অর্থায়নে এই সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্স আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনার ও কোর্সে ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৭৫ জন সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। প্রথমদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সেমিনার দিয়ে সেমিনার পরিচালনা করেন ফাদার ইউজিন জাস্টিন আঞ্জুস সিএসসি। তিনি খ্রিস্টীয় উপাসনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোচনা করেন এবং উপাসনায় পুণ্য সঙ্গীতের গুরুত্ব ও যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কোর্সের ২য় ও ৩য় দিনে উপাসনায় ব্যবহৃত পুণ্য সঙ্গীতসমূহ একসুরে ও শুদ্ধসুরে গান করার চর্চা করা হয়, যা পরিচালনা করেন মিস্টার বিপুল রিছিল, মিসেস লতা নকরেক, মিসেস শিল্পী চাম্বগং ও মিস্টার সুপার চিসিম। চতুর্থদিনে উপাসনায় সামসঙ্গীতের উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুণ্য সঙ্গীতের প্রচলিত সুরে সামসঙ্গীত চর্চা করা হয়। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনার ও কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ধর্মপ্রদেশীয় প্রার্থনা ও উপাসনা কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা।

ক্যামব্রিজ এ লেভেল প্রোগ্রামের প্রথম সমাবর্তন

ব্রাদার বিকাশ ভিক্টর ডি'রোজারিও সিএসসি: ১ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (SJIS) ক্যামব্রিজ এ লেভেল প্রোগ্রামের প্রথম সমাবর্তন (First Convocation Ceremony) উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এক গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক স্পর্শ করেছে। শনিবার, ঢাকার গুলশান ২-এর লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে আয়োজিত এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ক্যামব্রিজ এ লেভেল ২০২৬ ব্যাচের প্রথম স্নাতকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বিকেল ৪:৩০ মিনিটে মর্যাদাপূর্ণ একাডেমিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ড. ফাদার চার্লস বি. গর্ডন সিএসসি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার জেমস রিপন গোমেজ সিএসসি, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও CSC, মি. জ্যোতি এফ. গোমেজ, জনাব শরিফুল আনোয়ার প্রমুখ।

এছাড়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা দায়িত্ব করেন জনাব রোনাল্ড ক্রুজ, মিস ক্ল্যাফি থমাস এবং জনাব সাফায়াদ বিন ইসলাম। আগত সকল সম্মানিত অতিথিকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।

এরপর জাতীয় সংগীত এবং বিদ্যালয়ের সংগীত পরিবেশন ও এক মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা-নৃত্য মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এবং স্নাতকদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাদার চন্দন বেনেডিক্ট গোমেজ সিএসসি উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। স্নাতকদের পক্ষ থেকে ভ্যালেডিক্টোরিয়ান আদিত্য রহমান এক আবেগঘন ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। ব্রাদার জেমস রিপন গোমেজ সিএসসি হলি ক্রস শিক্ষাদর্শন এবং দক্ষ, মানবিক ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর জনাব জ্যোতি এফ. গোমেজ, ড. ফাদার চার্লস বি. গর্ডন সিএসসি এবং জনাব তারেকুল ইসলাম স্নাতকদের অভিনন্দন জানিয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রধান অতিথি ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি-এর মূল প্রবন্ধ (Keynote Address)। তাঁর গভীর চিন্তাশীল ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে তিনি স্নাতকদের বিনয়, সাহস এবং মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম স্মরণীয় পর্ব ছিল গর্বিত অভিভাবক, শিক্ষক এবং অতিথিদের করতালির মধ্য দিয়ে প্রতিটি স্নাতকের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ব্রাদার বিকাশ ভিক্টর ডি'রোজারিও সিএসসি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর আনুষ্ঠানিক পর্বের সমাপ্তিতে স্মারক কেক কাটা হয় এবং পরে অনুষ্ঠিত হয় গ্রুপ ফটোগ্রাফি মধ্য দিয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করা হয় এবং রাত ৯:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৬-২০২৭/২৫৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

৩ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের জন্য যোগ্য চাকুরী প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ	পদের নাম	কর্মস্থল	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	কাজের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	ভিডিও এডিটর	ঢাকা	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে	- ভিডিও ধারণ করা। - ভিডিও এডিটিং করা। - গ্রাফিক্স ও এনিমেশন এর কাজ করা। - কনটেন্ট প্লানিং ও ড্রাফটিং করা। - পাবলিশ করার জন্য ভিডিও ফাইনাল করা।	- শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রী পাশ হতে হবে তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের জন্য এইচএসসি পাশ গ্রহণযোগ্য হবে। - ভিডিও এডিটিং এ ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। - ভিডিও এডিটিং এর উপর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	সংবাদ উপস্থাপক	ঢাকা	০৩	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে	- সচিত্র (ভিডিও) প্রতিবেদন উপস্থাপন করা। - সংবাদ পাঠ করা। - ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করা। - dcnewsbd.com- এ সংবাদ প্রকাশ করা এবং মাসিক সমবার্তার জন্য সংবাদ সংরক্ষণ করা। - সচিত্র প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রকাশ করা। - প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনাসমূহের (ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, ব্রোশিয়র, বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন ইত্যাদি) জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করা।	- শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রী পাশ হতে হবে তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের জন্য এইচএসসি পাশ গ্রহণযোগ্য হবে। - সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ লেখা এবং ফটোগ্রাফিসহ উল্লেখিত কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - অধিক কাজের চাপ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং অফিসের প্রয়োজনের যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকতে হবে। - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কন্টেন্ট তৈরীর বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
৩	সংবাদ কর্মী	সমগ্র বাংলাদেশ	২০	প্রযোজ্য নয়	পুরুষ/ মহিলা	টার্গেট ভিত্তিক	- দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ, যাচাই এবং প্রকাশ। -স্থানীয় খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের সংবাদ ও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার। - সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম, উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং জনকল্যাণমূলক সংবাদ প্রকাশ। - সাধারণ মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি। - জুলুম-নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সামাজিক অসঙ্গতির সংবাদ অনুসন্ধান ও প্রকাশ। - রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন। - দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সাফল্যের গল্প তুলে ধরা। - অনলাইন সংবাদ প্রকাশ, ফিচার, সাক্ষাৎকার, বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন এবং মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট প্রস্তুত ও প্রচার।	- শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বনিম্ন এইচএসসি পাশ হতে হবে। - ছাত্র/ছাত্রী কিংবা অন্য পেশার সাথে জড়িত থেকেও এ কাজে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন। - স্থানীয় ভাবে বসবাসকারী এবং উদ্যোমী হতে হবে। - ডিজিটাল যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।
০৪	ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার	ঢাকা	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- প্রতিষ্ঠানের সকল যানবাহনের দৈনন্দিন পরিচালনা ও তদারকি করা। - যানবাহনের রুট পরিকল্পনা ও সময়সূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। - চালকদের দায়িত্ব বণ্টন, উপস্থিতি, কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করা। - যানবাহনের নিয়মিত সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। - ফিটনেস, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন, রুট পারমিট, বীমা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সময়মতো নবায়ন নিশ্চিত করা। - জ্বালানি ব্যবহার, মাইলেজ, লগবুক ও পরিবহন ব্যয়ের সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। - বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পরিবহন চাহিদা সমন্বয় করে সময়মতো সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। - চালকদের প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ড্রাইভিং এবং যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	- শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রী পাশ হতে হবে তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের জন্য এইচএসসি পাশ গ্রহণযোগ্য হবে। - অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর ডিপ্লোমা থাকতে হবে। - পরিবহন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা থাকতে হবে। - সড়ক পরিবহন আইন ও নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। - সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

শর্তাবলীঃ

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৬। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রাথীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৭। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৮। আবেদন পত্র আগামী ২০ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

মঞ্জু মারীয়া পালমা
সেক্রেটারী
দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
এডমিন এন্ড এইচ আর ডি ডিপার্টমেন্ট
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
২৬ নং, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/১৫৬/২৬

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ
বিকাশ নম্বর:
০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ২৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 27
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 August, 2026, ২৫ - ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন

প্রয়াত যোসেফ কস্তা

জন্ম: ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

“নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়ন মাঝে নিয়েছ ঠাঁই”

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেলো। এলো বেদনাবিধূর সেই দিন ১৫ আগস্ট। আমাদের পরিবারের জন্য এটি শোকের মাস। সেদিন আমাদের দুঃখের সাগরে ফেলে পরম পিতা তোমাকে নিয়ে গেছেন তার গৃহে। তোমার এভাবে চলে যাওয়াতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। তোমার এই শূন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি, তবুও তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দয়ালু, ধৈর্যশীল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্বর্গসুখ দান করেন। তুমি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শ নিয়ে একত্রে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

পরিবারবর্গ
জুলিয়েট তেরেজা কস্তা ও সন্তানেরা
দেওগাঁও, ধরেণ্ডা মিশন
সাভার, ঢাকা।

বিপ্র/১৫৬/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org